দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ * ১৮ তম সংখ্যা * ০২ ডিসেম্বর ২০২৪

এই সংখ্যায় থাকছে

- ডিসেম্বর - বাংলাদেশের বিজয়ের মাস : এখন বাংলাদেশ ২
- দেশের মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করার সুযোগ দেয়া যাবে না - গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি ৪
- বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে - কংগ্রেসের আহবান ৪
- ইসরাইল - হামাস যুদ্ধের এক বছর গাজায় ইসরাইলের নৃশংস বোমাবর্ষণ ৫
- মণিপুরের সমস্যা সমাধানে সীমানা প্রাচীর কোন সমাধান নয়। ৭
- করিমগঞ্জ থেকে শ্রীভূমি; কুযুক্তির শাক দিয়ে অপকর্মের মাছ ঢাকা ৮
- বিধানসভা ভোটে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার সঙ্গে ভোটার তালিকা ও পদ্ধতি নিয়ে নির্বাচন কমিশন গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন ১০
- নাগরিক স্মৃতিচারণা : কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর বাংলা ১৩
- 'ধ্রুপদী ভাষা' বাংলা- তকমার তাৎপর্য ১৫
- শিক্ষাসত্র শতবর্ষে ১৭
- আদানির মুখোশ মোদী বিপাকে - তাই সংসদে আলোচনা হতে দিচ্ছেন না ১৮
- সংবিধান প্রণয়ন : বাবাসাহেব আম্বেদকর ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ২০
- সলিল চৌধুরী : সংগীতের জগতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ২৩
- সার্ধশত বর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি : বিরসা মুন্ডা (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫ - ৯ জুন ১৯০০) ২৪
- ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাব কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থ চলে গেছে হ্যাকারদের একাউন্টে ২৭
- স্মরণ : অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী ২৮
- স্মরণ : কবি অরুণ চক্রবর্তী ২৮
- উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে প্রাচীন মসজিদ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি ২৮
- বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে দু একটি কথা ২৯

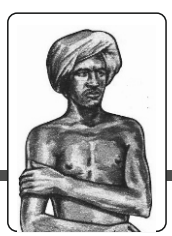

সম্পাদকীয়

দুই দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি এক সূত্রে বাধা

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তান নামক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। পাক আমলে ওই বাংলার মানুষকে লড়তে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ নজরুল লালনের গান শোনবার জন্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রাম ও অপরিসীম ত্যাগের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান। এই ২৪ বছর ব্যাপী লড়াইয়ের বিরোধী পাকিস্থান পন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির পিছনেও কিছু জন সমর্থন ছিল।যারা গঠন করেছিল রাজাকার বাহিনী।পাক সেনাদের সমর্থনে চালিয়েছিল নারকীয় হত্যালীলা। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রবর্তন করেছিল ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান। দ্বিজাতিতত্ত্ব যে অসাড় তা প্রমাণিত হয়েছিল। দুই দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিই খুব মুসরে পড়ে। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তির অতিরিক্ত আত্মসন্তুষ্টির জন্য বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতা নিহত হন। সংবিধান পরিবর্তন করে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করা হয়।

মুক্তি যুদ্ধের চেতনার ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চলতে থাকে।দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলেও তিনি তা ধরে রাখতে পারেন নি। এক জনপ্রিয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁর বিরোধীরা ক্ষমতায় এলেও এদের মূল চালিকা শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক শক্তি।আজ ওই দেশে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আক্রান্ত। আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ , লালন , পীর, সুফি সমাজ। এই দেশে এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি। ওই দেশে ইসলামিক সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় আসায় এরা খুবই আশাবাদী। এদের পক্ষে বাংলাদেশ দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করা যাবে। এই দুই শক্তি পরস্পরের পরিপূরক। জনগণকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

সম্পাদক
শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।
ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

ডিসেম্বর বাংলাদেশে বিজয়ের মাস : এখন বাংলাদেশ

ঢাকা থেকে আবদুল্লা আল ওয়াসি

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। অনেক স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে এই দেশটি স্বাধীন হলেও তার কাঙ্খিত মুক্তি ও স্বাধীনতা এখন পর্যন্তও অর্জিত হয়নি। মুক্তি অর্জনের পথে কতোটুকু এগিয়েছি, নাকি পিছিয়ে পড়েছি সেটাও এখন গবেষণার বিষয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে অনেকে অনেক কু-কথা বলেন, দিনরাত তাঁর বিষোদগার করেন। কিন্তু, তাঁরা জানেন না, বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। বাংলাদেশে বাস করে তার ঐতিহাসিক সত্যকে মুছে ফেলার আয়োজন এখন সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। সেদিন দেখলাম বিদ্যুৎ বিলের কপির ওপর যেখানে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছাপা ছিল সেখানে নীল কালির সীল্ মেরে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিদ্বেষ এখন সাধারণ মানুষই শুধু নয় বরং, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা করা হচ্ছে। অথচ, আমার ধারণা, এঁরা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারবে না যে, বঙ্গবন্ধুর অপরাধ আসলে কী? গতবাঁধা কিছু কথা তাঁরা বলবে। কিন্তু, বঙ্গবন্ধু কি পুকুর চুরি করেছেন নাকি সাগর চুরি, তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা, উত্তর তাঁদের কাছে নেই। থাকার কথাও নয়। আজকের দিনের বড় বড় নেতারা, যাবতীয় ফেসবুক আর, ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সারেরা যারা প্রবলভাবে দেশপ্রেমের বয়ান দিয়ে যান তাদের কারোরই না আছে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ বা, সাহসিকতা। তাঁদের অধিকাংশই কারাভোগের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এখন বড় বড় কথা বলেন। অথচ, বঙ্গবন্ধু এই দেশের মানুষের মুক্তি ও সাধারণ মানুষের পক্ষে থেকে তাদের অধিকারের দাবীতে তাঁর জীবনের প্রায় তেরোটি বছর কারাগারেই কাটিয়েছেন। 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের ফ্ল্যাপ কাভারে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বলছেন, ''ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার কিছুটা এই 'কারাগারের রোজনামচা' বই থেকে পাওয়া যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা-বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।''

বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন। বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে এ আত্মবিশ্বাস বারবার তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন কি না আমি জানি না।

মজার ব্যাপার হলো বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা দুইদিন আগেও একটা চাকরি পাওয়ার প্রত্যাশায় এইসব বই থেকে নানা বক্তব্য বা, উদ্ধৃতি মুখস্থ করতো তারাই এখন প্রবল বিদ্বেষে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলতে চাইছে। সার্জিস আলম সময়ের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আবেগঘন ভিডিও তৈরি করলেও পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার মুখে এখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোন রা নেই। এরকম প্রচন্ড সুবিধাবাদী আর, নিজ স্বার্থমগ্ন গোষ্ঠীর উত্থান যখন হয় তখন তাদের থেকে দেশের সামষ্টিক কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশি। এসব তরুণ ও অনভিজ্ঞ নেতারা এখন নানান হঠকারী ও বিচার-বিবেচনাহীন কথাবার্তা বলে চলেছেন। মিডিয়া কাভারেজের দরুন যার অব্যাহত প্রচারে বাংলাদেশকে আরও বিপদসংকুল পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এদের সাথে যুক্ত আছে বাইরের দেশে অবস্থানকারী বিভিন্ন ইউটিউবার, ইনফ্লুয়েন্সার। এঁদের অব্যাহত প্ররোচনায় একটি দেশের শান্তিকামী জনগণ ক্রমান্বয়ে যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি যেখানে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহনশীল, ক্রমেই তা অসহিষ্ণুতার পথে হাঁটছে, যা দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এইসব ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সারেরা যে যুদ্ধ পরিস্থিতির ক্ষেত্র তৈরি করছে তার দায় কিন্তু তাঁরা নেবেন না। দেশের মানুষ যুদ্ধে জড়ালেও তাঁদের কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু, সাফারার হবো আমরা, মানে এই দেশে বাস করা নিরীহ আম-জনতারা। বিদেশের মাটিতে বসে থাকা ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সারেরা বাংলাদেশকে নিয়ে যে গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত খেলায় মত্ত তা নিয়ে সচেতনতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

সদ্য বিতাড়িত আওয়ামীলীগ নজীর বিহীন দুর্নীতি, অর্থনৈতিক লুটপাট করেছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও দেশের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন ব্যাহত হয়নি। অর্থনৈতিক নেতিবাচক সূচকের ধারণা বাংলাদেশে কাজ করেনি। এটা হয়তো আন্তর্জাতিক শক্তি ও বোদ্ধা মহলের অনেকের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। দেশের অগ্রযাত্রায় অর্থনীতির সূচকই যে মূল বিষয় নয় তা যখন স্পষ্ট হতে যাচ্ছে তখনই ক্ষমতার পালা-বদল। আমি লুটপাট-দুর্নীতির সমর্থন করছি না। কিন্তু, লুটপাট-দুর্নীতি বন্ধ করতে যে নৈতিক মনোবল ও উন্নত মাইন্ডসেটের প্রয়োজন তা কি আমাদের আছে? এক পক্ষের দখলদারি ও চাঁদাবাজির জায়গায় এখন আরেক পক্ষ সক্রিয় হয়েছে। আওয়ামীলীগ আমলে বিএনপি-জামায়াত নির্মূলের যে চেষ্টা হয়েছে, এখন সম্মিলিত শক্তি আওয়ামীলীগ নির্মূলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ, মুদ্রা একই আছে। শুধু তার পিঠের পরিবর্তন হয়েছে। অথচ, বাংলাদেশের ভালোর জন্য, ভবিষ্যতে সুস্থ রাজনীতির চর্চা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল

'বিপ্লব' পরবর্তী সময়ে একটা ইনক্লুসিভ শাসন কাঠামো তৈরি করা। যেখানে রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা নয় বরং, দেশপ্রেমিক রাজনীতিক ও দুর্নীতির অভিযোগমুক্ত, সৎ ও উদ্যমী মানুষদের সমন্বয়ে একটা সমন্বিত সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নের। এখন যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে আওয়ামীলীগ মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়েই অন্তবর্তী সরকার কাজ করছে।

ফ্যাসিজম বা, ফ্যাসিবাদ নিয়ে অতীতে বহু লোক সরব থেকেছে। কিন্তু, এখন বর্তমানে যা ঘটছে বা, চলছে সেটাও যে 'ফ্যাসিজম' সেটা চিহ্নিত করার বা, বলার মতো ইনটেলেকচুয়াল'দের আর দেখা যাচ্ছে না। ফ্যাসিবাদকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এই দু'মুখী নীতি বুদ্ধিবৃত্তিক সুবিধাবাদের দিকই নির্দেশ করছে।

মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ভারতের মিডিয়ায় বাংলাদেশকে নিয়ে অব্যাহত অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেছেন। মিডিয়া অনেক কিছু বলে বা, প্রচার করে। কিন্তু, তাই বলে একটা দেশের পররাষ্ট্র নীতি কি শুধু মিডিয়া নির্ভর হলেই চলে? ভারতের মিডিয়া অপপ্রচার করছে, ঠিক। কিন্তু, যাঁদের নিয়ে অপ-প্রচার করছে সেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশের জনগণ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাঁদের সমস্যা কী হচ্ছে বা, তাঁদের বক্তব্য শোনার চেয়ে মিডিয়ার অপপ্রচার মূল বিষয় হয় কী করে? একদল সংক্ষুব্ধ মানুষ বিনা কারণে, কোন যুক্তি ছাড়াই অসহিষ্ণু হবে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সর্বশেষ ইসকন্ নেতাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সরকার তাদের অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। আমি ইসকন সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না। ইসকন নেতা সম্পর্কেও আমার ধারণা নেই। তবে, তাঁর গ্রেফতারের পর চট্রগ্রাম ময়দানে দেয়া ২৩ মিনিটের একটি ভাষণ আমি শুনেছি। সেখানে তাঁর বক্তব্যের মাঝে আমি কোন উস্কানি ও রাষ্ট্র-দ্রোহীতার মতো কথাবার্তা পাইনি। অথচ, তাঁর থেকেও সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহী মূলক কথাবার্তা অনেকেই এখন বলছেন। কেউ কেউ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার কথাও প্রকাশ্যে বলছেন। ইসকন নেতার বক্তব্য থেকে যেটা বুঝলাম, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে চলা দীর্ঘদিনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর ভাষণে তিনি জগতজ্যোতি দাসের প্রসঙ্গ তুলে হয়তো সেনাবাহিনীর বিরাগভাজন হয়েছেন। তবে, ইসকন নেতা যা বলেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে যেখানে ভবিষ্যৎ সংস্কারের পথে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সেখানে সরকার দেখিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া। কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা তার ধর্মের মানুষের স্বার্থে বা, সম-অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হতেই পারেন, যেখানে তিনি সরাসরি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কথা বলছেন, সাম্প্রতিক বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলছেন, সেই পর্যায়ে তিনি আর স্রেফ ধর্মীয় নেতা নন বরং, সেই সম্প্রদায়ের মানুষের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের একজন আইকনিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। অতএব, তাঁকে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে গ্রেফতার ও আটক-রিমান্ডের ঘটনা দেশে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতাকে বৃদ্ধি করবে, এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ইসকনের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, সেই নেতার নৈতিক স্খলন জনীত কারণে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। তাঁর নৈতিক স্খলন ঘটে থাকলে সংগঠনের নিয়ম বা, দেশের আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কিন্তু, তিনি যা বলছেন সেই বিষয়গুলোকে এর দ্বারা বাতিল বা, ভুল প্রমাণ করা যাবে না। অর্থাৎ, দুটো ভিন্ন বিষয়কে এক করে দেখে সমস্যাকে পাশ কাটানো যাবে না। এই বোধ ও বিবেচনা নিয়েই সরকারের পদক্ষেপ নেয়া জরুরি।

বাংলাদেশে অস্থিতিশীল, অসহিষ্ণু পরিবেশ সৃষ্টি হলে কার লাভ? এতে লাভ আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তিগুলোর। আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তি তাদের স্বার্থ দেখে চলে। সে অঞ্চলে বসবাস রত সাধারণ মানুষের মঙ্গলের কথা তারা বিবেচনায় নেয় না। আরবের ইসরায়েল-ফিলিস্তিন, এশিয়ার আফগানিস্তান, এমনকি বর্তমান ইরানও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ফলাফল। আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, এই দেশ পার্শ্ববর্তী দেশের 'প্রেসক্রিপশনে' চলে। এখন সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ যদি কোন বৃহৎ শক্তির সরাসরি 'নিয়ন্ত্রণে' চলে যায় তাহলে সেই দশা কী আমাদের জন্য ভালো কোন ফল বয়ে আনবে? নির্দেশ আর, নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যে ফারাক, সেই ব্যবধানও যদি ঘুঁচে যায় তাহলে কী আমরা জাতি হিসেবে আর দাঁড়াতে পারবো?

যে কোন দেশের উন্নয়ন ও আধুনিকতার পেছনে থাকেন সেই দেশের ইনটেলেকচুয়াল, ভিশনারী ও আধুনিক চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন বুদ্ধিমান রাষ্ট্র নায়কেরা। আধুনিক আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা স্যার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, টমাস জেফারসন বা, আব্রাহাম লিঙ্কন এঁরা সবাই ছিলেন সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা, সংস্কারমুক্ত প্রগতিবাদী। তাঁদের ভবিষ্যৎ মুখী সিদ্ধান্ত ও তার বাস্তবায়নের দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমেই সেই দেশ এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য সে রকম সৎ, প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত ও ভিশনারী রাজনৈতিক নেতৃত্বর এখন ভীষণ প্রয়োজন। নয়তো দেশি-বিদেশি নানা মাত্রার চক্রান্তে আমাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব হুমকীর মধ্যে পড়তে পারে। বিজয়ের প্রথম দিনে বাংলাদেশের সঙ্কটময় সময়ে আমি সেইসব প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত, ইনটেলেকচুয়াল'দের আহবান জানাই, যাঁরা এই দেশকে সত্যিকার অর্থেই একটা উন্নত ও মজবুত ভিত্তির মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে। সেইসব মানুষদের একত্রিত হয়ে এগিয়ে যাওয়া এখন বাংলাদেশের সময়ের দাবী। ধন্যবাদ সবাইকে।

দেশের মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করার সুযোগ দেয়া যাবে না- গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি

অধ্যাপক আনু মহম্মদ

''সম্প্রতি সম্মিলিত সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণকে পতাকা অবমাননার মামলায় গ্রেফতার করে যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে তা অবাঞ্ছিত। সরকারের এই অপরিণামদর্শীতার কারণেই অযথা চট্টগ্রামের তরুণ আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে নিহত হতে হল। আমরা সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যা করার ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানাই এবং সরকারের কাছে দাবী করি অনতিবিলম্বে উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আলিফ হত্যায় জড়িতদের বের করে তাদের বিচার নিশ্চিত করা। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কয়েকজনকে ভিডিও দেখে আলিফ হত্যায় জড়িত বলে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেফতারও করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের অস্বচ্ছতা প্রত্যাশিত নয়। উপযুক্ত তদন্তের আগে আলিফ হত্যা নিয়ে কোন ধরনের মিডিয়া বা ফেসবুক ট্রায়ালেরও আমরা বিরোধিতা করি। আলিফ হত্যার পরে যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরী করতে চেয়েছিল দেশী বিদেশী নানান চক্রান্তকারী মহল, সেটি প্রতিহত করতে যেভাবে দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছেন সেজন্য গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানায়। বাংলাদেশের জনগণ আবারও কারো ফাঁদে পাড়া না দিয়ে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটা উদাহরণ তৈরি করেছেন।'

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি মনে করে বাংলাদেশকে এখন যে নানান মাত্রিক দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই বৈচিত্র্যের ঐক্য। দেশের সকল ধর্মের, সকল জাতির, সকল লিঙ্গের, সব ধরনের শ্রেণী পেশা সংস্কৃতির মানুষের মধ্যেকার ঐক্যই পারে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে।

কিন্তু সরকারের কেউ কেউ সহ কয়েকটি মহল এ বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আর একারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি গণঅভ্যুত্থানের পরে গত তিন মাসে একের পর এক মাজারে হামলা হল, প্রপাগান্ডা বাদ দিলেও হিন্দুদের বাড়িঘরেও হামলা হল, শ্রমিকের উপর গুলি চলল, আদিবাসীদের উপর হামলা হল, রিকশাওয়ালাদেরকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা চলল, নারীবিদ্বেষী প্রচার প্রপাগান্ডা চলল, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী কাজকর্ম চলল, বাজারে সিন্ডিকেটবাজি চলল , কিন্তু এই সবকিছুতেই সরকারের ভূমিকা আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয় এবং অকার্যকর থাকল। উপরন্তু যেকোন গণতান্ত্রিক দাবীর আন্দোলনকেই ফ্যাসিবাদের দোসরদের কাজ বলে ট্যাগ দেয়ার চেষ্টা, গণঅভ্যুত্থানকারী শক্তিগুলোর মধ্যে বিভাজনসৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রদান বা দায়িত্বজ্ঞানহীন মতামত প্রকাশ, সর্বোপরি পরিস্থিতি সামাল দিতে চরম ব্যর্থতা, এসব কিছুই নানান রকম বিভাজনকে উস্কে দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলছে, যার সুযোগ নেয়ার জন্য পতিত স্বৈরাচার এবং দেশী বিদেশী নানান চক্রান্তকারীরা বসে আছে।

আমরা একারণেই মনে করি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনায় না নিয়েই পতাকা অবমাননার মতো বিভ্রান্তিমূলক মামলায় চিন্ময়কে গ্রেফতার করাটা সরকারের জন্য সুবিবেচক কোন কাজ হয়নি। আমরা চাই অনতিবিলম্বে চিন্ময়কে জামিন দেয়া হোক। চিন্ময়ের বিরুদ্ধে যদি দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার কোন তথ্যপ্রমাণ সরকারের কাছে থাকে তাহলে সেটা তারা আগে প্রকাশ করুক। আমরা মনে করি, গণঅভ্যুত্থানকে টিকিয়ে রাখতে হলে কোন ধর্মের নামেই কোন প্রকার ফ্যাসিবাদী চর্চাকে প্রশ্রয় দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এদেশের হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কোন ধর্মের সাধারণ দেশপ্রেমিক মানুষই এইসব ধর্মের নামে ফ্যাসিবাদী সংগঠনের তৎপরতাকে সুনজরে দেখেন না।

ফলে আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাই, আইনজীবী আলিফের হত্যার বিচারের পাশাপাশি গত তিন মাসে ঘটা মাজারে হামলা, হিন্দুদের উপর হামলা, আদিবাসীদের উপর হামলা, শ্রমিকের উপর গুলি চালানো, নারীদের উপর হামলা - এই সকল ঘটনার কঠোর বিচার নিশ্চিত করুন। সকল প্রকার ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ, নারীবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, ঘৃণার চাষের বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর অবস্থান নিন।'

বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে-কংগ্রেসের আহবান

শুভঙ্কর সরকার

বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ইসকনের পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার আতঙ্কজনক। ভক্তি আন্দোলন সকলকে নিয়ে একসঙ্গে চলার মতবাদ ও অহিংসার প্রচার করে।

এই কারণেই শ্রী রাহুল গান্ধী সর্বদা সংবিধানে নির্দেশিত মহাত্মা গান্ধীর ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অহিংসার নীতিগুলি সঙ্গে নিয়ে পথ চলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সব ধর্মের জন্য সমান এবং সর্বোচ্চ সম্মান এবং বিবেচনাকে নিশ্চিত করে। তাই ধর্মীয় অনুরাগ এবং আনুগত্যের জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে একটি আইন হিসাবে ব্রিটিশরা তার ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিকে বশীভূত করার জন্য প্রবর্তন করেছিল। যদিও রাষ্ট্রদ্রোহ আইন হিসেবে যুক্তরাজ্যে আর কোনো

অপরাধ নয়, তবুও ভারত ও বাংলাদেশের সরকার ভিন্নমত ও সংখ্যালঘুদের দমন করতে ব্যবহার করে। বিভিন্ন দেশে নিজ নিজ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য আইন সর্বদা সর্বোচ্চ এবং সর্বাগ্রে। বাংলাদেশে হিন্দুদের সাথে এবং ভারতে মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকার যে আচরণ করেছে তা হতাশাজনক। আমি বাংলাদেশে ইসকনের পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভুকে গ্রেফতারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিন্দা জানাই এবং সম্বলের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারেরও নিন্দা জানাই।

বিজেপি হিন্দুত্বের ধারক-বাহক বলে দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তারা সবসময় হিন্দুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বুঝতে পারে না যে ধর্মের সুরক্ষা কেবল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমেই সহজতর হতে পারে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গ্রেপ্তার এবং সাম্প্রতিক মতবিনিময়গুলিও বিজেপির বৈদেশিক নীতি এবং বহিরাগত বিষয়ে ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে।

আমি আশংকা করছি যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে পররাষ্ট্রনীতিতে তার ব্যর্থতা থেকে মনোযোগ সরাতে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শীঘ্রই ইস্কন পুরোহিত, চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘু নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশের পাশাপাশি উত্তর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির আহ্বান জানাতে কর্মসূচি এবং সমাবেশ শুরু করবে।

ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের এক বছর
গাজায় ইসরাইলের নৃশংস বোমাবর্ষণ

সৌর বসু

হামাসের ইসরাইল আক্রমণের পর এক বছর অতিক্রান্ত হল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস অতর্কিতে দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলা চালায়। এই হামলার জন্য ইসরায়েল প্রস্তুত ছিল না। ফলে ১২০০ র বেশি ইসরাইলের নাগরিক প্রাণ হারায় এবং এর মধ্যে বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিক। এছাড়াও ২৫০ জনকে আটক করা হয়।

হামাস আক্রমণের পর ইসরাইলের প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ নৃশংসতার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে। বিগত এক বছরে গাজা ভূখণ্ডে ৪০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা হয়েছে, যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১১ হাজারেরও অধিক। নিরাপরাধ মহিলাদেরও নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। গাজার বিদ্যালয় ,বিশ্ববিদ্যালয়, উপাসনা গৃহ, হাসপাতাল , আবাসিক এলাকাগুলো ছিল আইডিএফ (ইসরাইল ডিফেন্স ফোর্স)এর লক্ষ্যবস্তু। এগুলোকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করা হয়েছে। শুধু নিহতদের কথা বললে সবটা বলা হয়ে যায় না।

ইসরাইলের এই হিংস্র আক্রমণের ফলে এক লক্ষেরও বেশি ফিলিস্তিনি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। শিশুদের, মা-বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। তারা আজ অনাথ।তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অনাহারে কত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে তার কোনও হিসেব নেই। ধ্বংসস্তুপের তলায় কত মানুষ

চাপা পড়ে আছে, তার সংখ্যা কেউ জানেনা। ইসরায়েল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লড়াই করছে না, তারা লড়াই করছে প্যালেস্টাইন কে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। তাদের ইতিহাসকে মুছে ফেলা তাদের উদ্দেশ্য। ইসরাইলের এই বর্বর আক্রমণকে সমর্থন করছে, পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলো, যার মধ্যে অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন হামাস কর্তৃক ইসরাইল আক্রমণের পর জেরুজালেমে ভ্রমণে গিয়ে ১২শ ইসরাইল নাগরিকের হত্যার জন্য শোক প্রকাশ করে , ইসরাইলের উদ্দেশ্যে বলেন, তুমি একা নও। যতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাকবে, তোমার পাশে দাঁড়াবে। তোমাকে আমরা একা থাকতে দেবো না। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ বাইডেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন , ইসরাইলের পাশে দাঁড়ানো আমাদের জাতীয় কর্তব্য। ফ্রান্স রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রো' র বক্তব্যেও ছিল হামাসের বিরুদ্ধে সমালোচনার তীব্র ঝাঁঝ। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এর ঘোষণাতেও পক্ষপাতিত্বের সুর,ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ইসরাইলকে প্রতিহত করার মধ্যে অধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশ ভারত বর্ষও পুঁজিবাদী দেশগুলোকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত এক বছরে ১৭.৯ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করেছে ইসরায়েলকে। মার্কিন দেশ একদিকে অস্ত্র সরবরাহ করছে ইসরাইলকে অন্যদিকে যুদ্ধ বিরতির কথা ঘোষণা করছে। ধ্বংস লীলাকে যারা সমর্থন করছে , তাদের মধ্যস্থতা করার কোন অধিকার নেই। প্যালেস্টাইনের বুকে যে ক্ষত হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব তার দংশন অনুভব করছে। ইসরাইলের মাটিতে তার রক্ত ঝরছে।

বর্তমানে এই যুদ্ধ শুধুমাত্র ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোকেও জড়িয়ে ফেলেছে। সিরিয়া, ইয়েমেন, লেবানন এবং ইরান, প্যালেস্টাইনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসরাইল লেবাননের উপর বোমাবর্ষণ করছে। তাদের লক্ষ্য লেবাননের হিজবুল্লাহ নামক বিপ্লবী সংগঠনটি। এটি শিয়া মুসলিমদের একটি সংগঠন। খোমেনি কর্তৃক ইরান বিপ্লবের পর, এই সংগঠনটি ইসরাইলের আক্রমণ কে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। সংগঠনটি ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের মডেল গ্রহণ করে। তখন থেকেই

ইরানের সঙ্গে হিজবুল্লাহর একটি সম্পর্ক বিদ্যমান।

ইসরাইল সেনাবাহিনী সম্প্রতি হিজবুল্লাহ সংগঠনের নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করে। নাসরুল্লাহকে হত্যা করার পর ইরান এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইজরায়েলের উপর ইরান প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ইরান পরমাণু শক্তি ধর দেশ। তারা এই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর যুদ্ধের গভীরতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছে এটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে। সেটা কিন্তু এখনই বলা যায় না। বর্তমানে এটি একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ।

প্যালেস্টাইনের নাগরিকেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। ১৯৪৮ সালে ইসরাইলকে রাষ্ট্র ঘোষণার পর থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন থেকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হলে ইসরাইলকে একটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের প্রস্তাব ছিল প্যালেস্টাইন, দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। একটি আরবদের এবং অপরটি ইহুদিদের। এছাড়া জেরুজালেম রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কিন্তু ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার পর প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী আরবরা উদ্বাস্তু হয়ে জর্ডান, মিশর সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । মিশর, সিরিয়ায় বসবাসকারী আরবরা ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার বিষয়টির বিরোধিতা করে। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান সম্মিলিতভাবে ইসরাইলকে আক্রমণ করে। ১৯৪৯ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শান্তি চুক্তির পর দেখা যায় যে ইসরাইল রাষ্ট্রসংঘ থেকে দেওয়া ভূখণ্ডের থেকে অনেক বেশি জমি দখল করে বসে আছে। যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড থেকে ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। যারা থেকে যায় তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার টুকু পর্যন্ত ইসরাইল কর্তৃপক্ষ কেড়ে নেয়। আরবদের কাছে ইসরায়েল হয়ে ওঠে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উন্মুক্ত কারাগার। বর্ণবৈষম্যের শিকার হয় প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী আরব নাগরিকেরা।

ইসরাইল যে মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠেছে তার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট অবদান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করে ইসরাইলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইলকে শক্তিশালী করে তোলার কারণ কি? তেলের খনি গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৩০ এর দশকে যে সাতটি তেলের কোম্পানি ছিল তার মধ্যে পাঁচটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৯৬০ সালে ইরান - ইরাক - সৌদি আরব-ভেনিজুয়েলা এবং কুয়েত তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তেল রপ্তানিকারী একটি জোট (oil producing and exporting country îy OPEC)প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭০ সালের গোড়া থেকে ওপেক সদস্য ভুক্ত দেশগুলি তেলের কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ শুরু করে। ১৯৭০ দশকের গোড়ায় তেল কোম্পানিগুলির হাতে ৮৫% তেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৯৭০ এর দশকের শেষে সেটা ৭ শতাংশে এসে ঠেকে। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরাইলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক দানা বাধতে শুরু করে। ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম এশিয়াকে তাদের দখলে রাখতে চেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলের পক্ষ নেবার পর আরব জোট মার্কিন দেশে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ব্যাপক সংকটের মধ্যে পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্তমানে পশ্চিম এশিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২ শতাংশ তেল আমদানি করে। বিশ্বের তেলের বাজারে ৬৭.২% নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি। খনিজ তেল পশ্চিম এশিয়ার অশান্তির মূল কারণ। পঞ্চাশের দশকের পর থেকেই ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়। আজও তা বর্তমান। ইরানের উপর ক্রুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরানকে বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যে নানা রকম নিষেধাজ্ঞা ইরানের উপর জারি করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ইরান রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দেয়। এখন ইরান এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক ভালো। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে ইরান রাশিয়ার পক্ষ শুধু নেয়নি, রাশিয়াকে ড্রোন দিয়ে সহায়তা করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। রাশিয়া এবং চীনের মধ্যেও সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে। তার ফলে ইরান রাশিয়া চীন একটি শক্তিশালী জোটে পরিণত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। আমেরিকা সহ পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলি এই জোটকে ভয় পাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সমরাস্ত্র পাঠিয়ে ইসরাইলকে শক্তিশালী করে তুলছে। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সিরিয়া, লেবানন,ইরান, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আছে। অন্যদিকে মিশর,জর্ডান, মরোক্ককে কব্জা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।হামাসের ইসরাইল আক্রমণের পর আরব দেশগুলি নিশ্চুপ।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি ভাবতে পারি, যুদ্ধের অবসান হয়ে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে পশ্চিম এশিয়ায়, নাকি ফিলিস্তিনিদের বাস্তুভূমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্র থেকে। ইসরাইলের রাষ্ট্রপ্রধান নেতানিয়াহু রাষ্ট্রপুঞ্জে পশ্চিম এশিয়ার একটি মানচিত্র প্রদর্শন করেন, নদীর বুক থেকে সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত, সেখানে ইসরাইলের বিস্তার । মানচিত্রে প্যালেস্টাইনের কোন অস্তিত্ব নেই। এই মানচিত্র প্রদর্শনের জন্য নেতানিয়াহু পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে বাহবা পায়। পক্ষান্তরে ফিলিস্তিনিরা স্বাধীনতার স্লোগান তুললে তাদের গনহত্যাকারী আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

ফিলিস্তিনিদের কি কোন অধিকার নেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কল্পনা করার যেখানে বর্ণবিদ্বেষ থাকবে না, স্বাধীন মতামত প্রকাশ

করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে না, সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।বর্ণবিদ্বেষ থেকে তো দক্ষিণ আফ্রিকা মুক্তি পেয়েছে, আফ্রিকার দেশগুলি আজ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তো আজ আর ইংরেজদের অধীনস্থ নয়। প্যালেস্টাইন কে একটি রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করতে দোষ কোথায়!

মণিপুরের সমস্যা সমাধানে সীমানা প্রাচীর কোন সমাধান নয়

মনিরুল হক

গত বছরের মে মাস থেকে জাতিদাঙ্গায় উত্তপ্ত হয়ে আছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে সুন্দর ও বৈচিত্রপূর্ণ রাজ্য মণিপুর। কিন্তু দেড় বছর পরেও আমরা দেখছি সেই মণিপুরের জাতিদাঙ্গার কোনও রকম নিরসন তো দূরের কথা, সামান্যতম নিরাময়ের ব্যবস্থাও সরকার করে উঠতে পারে নি। উল্টে সেই সুন্দর রাজ্যের মানুষদের মনের ক্ষত আরও গভীর হয়েছে, তাঁরা আরও হতাশায় ডুবে যাচ্ছেন। বিজেপি-আর এস এস এর প্ররোচনায় রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী মেইতেই গোষ্ঠী দ্বিতীয় প্রধান কুকি জনগোষ্ঠীর প্রতি চরম বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে ওঠেন এবং ফলস্বরূপ জাতিদাঙ্গায় জর্জরিত হয়ে ওঠে মণিপুর। আজ সেই মেইতেই জনগোষ্ঠীই আক্রমণ করছেন বিজেপি দলের মেইতেই মূখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মেইতেই মন্ত্রী ও পদাধিকারীদের বাড়িঘর এবং সম্পত্তি। গত দেড় বছর ধরে যিনি ছিলেন ঔদ্ধত্য ও আস্ফালনের প্রতীক, সেই মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং আজ ভিজে বেড়ালের মতো ঘরে বসে সভা ডাকলেও বিধানসভার তার দলের সদস্যদের অর্ধেকও উপস্থিত হচ্ছেন না।

এক লম্বা সময় ধরে বীভসৎতা এবং তার পরেও ধিকিধিকি আগুন, একচক্ষু সরকার, ভয়-ভীতি, পুলিশ-সেনা অভিযান, আড়াইশোর বেশি মানুষের মৃত্যু, গ্রাম-কে-গ্রাম ধ্বংস, ষাট হাজার মানুষের বাস্তুচ্যুত হয়ে থাকা এবং পারস্পরিক হিংসার বাতাবরণে মণিপুরের মানুষ কাটাচ্ছিলেন আপাত শান্ত মনুষ্যতর এক জীবন। কিন্তু ৭ নভেম্বরে এক কুকি মহিলাকে অপহরণ ও খুন হিংসায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করল। ১১ নভেম্বর নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে একতরফা ভাবে খুন হন ১০ জন কুকি জনগোষ্ঠীর মানুষ। সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, তাঁরা ছিলেন কুকি মিলিট্যান্ট। আর Indigenous Tribal leaders' Forum এর দাবি তাঁরা ছিলেন গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্য। একই সঙ্গে খবর এলো শরণার্থী শিবিরে থাকা মেইতেই গোষ্ঠীর তিন মহিলা ও তিন শিশু অপহৃত হয়েছেন এবং নৃশংস ভাবে খুন হয়েছেন। আর এ সবটাই ঘটেছে জিরিবাম জেলায়, যা সেই তীব্র হাহাকারের দিনগুলিতেও অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল।

সরকারের কাছে বিষয়টা হয়ে দাঁড়াল আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা। অতএব তাঁরা যথা নিয়মে এক পক্ষের প্রতি শোক-জ্ঞাপন করলেন এবং অন্য পক্ষের প্রতি হুমকি প্রদান করলেন আর সেনা কর্তারা ঘটা করে জানিয়ে দিলেন- 'আরও সৈন্য সামন্ত এনে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার ব্যবস্থা পাকা করা হচ্ছে'। এই মুহূর্তে মণিপুরে রাজ্য পুলিশ আছেন ৪৮০০০ জন এবং সামরিক বহিনীর ও কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর মোট সংখ্যা হল ৪২০০০ জন। অবস্থানগত দিক থেকে ইম্ফল শহর এবং তাকে ঘিরে ইম্ফল উপত্যাকায় বাস করেন রাজ্যের ৬০ শতাংশ মানুষ। বলা বাহুল্য এখানকার বেশিরভাগ মানুষই মেইতেই গোষ্ঠীর। সরকার মনে করছিল এই এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো তাই এই এলাকার ১৯ টি থানা এলাকা বাদ দিয়ে বাকি রাজ্যে বহাল ছিল আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট বা ' আফস্পা ' , যা এক কুখ্যাত আইন বলেই আমরা জানি। এই নভেম্বরের ঘটনার পর এর মধ্যে ৬টি থানা এলাকাকে আবার আফস্পার আওতায় আনা হয়েছে। সম্ভবত সরকারী কর্তাব্যক্তিদের নিরাপত্তা রক্ষার কারণেই এটা করা হয়েছে বলে মনে করেন ওয়াকিবহাল মহল। মেইতেইদের সামাজিক সংগঠন সমূহের যৌথ কমিটি কোকোমি তাদের এলাকায় এই আফস্পা চালু করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এর আশু প্রত্যাহার না হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। মনে রাখতে হবে সংঘর্ষের প্রথমদিকে এই কোকোমি বীরেন সরকারকে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়েছিল। আর অপরদিকে কুকি এম এল এ-রা এবং কুকি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ইম্ফল উপত্যকার বাকি অংশেও আফস্পা জারি করে সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে যা একতরফাভাবে লুট করেছিল মেইতে লুপিন ও আরামবাই তেঙ্গোল নামের জঙ্গী সংগঠনগুলি।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিলেন, কুকি ও মেইতেই নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চলছে নাগা মধ্যস্তকারীদের সাথে। কিন্তু এই নভেম্বরের ঘটনার পর হঠাৎই বিজেপির সভাপতি নাড্ডা সাহেব ঘোষনা করে দিয়েছেন মিয়ানমারের নাগরিক কিছু কুকি জঙ্গি মণিপুরে এসে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য কুকি জনগণ এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্ত্যব্যের জন্য আলোচনার পরিবেশ অবশ্যই আরও বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

মণিপুরের মত একটা রাজ্যের প্রধান দুই জনগোষ্ঠীর একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে বিজেপি যে ভাবে আধিপত্যের নীতি কায়েম করতে চাইছে তার জুড়ি মেলা ভার। মনে রাখতে হবে মেইতেইরা মূলত একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ কিন্তু এ কথা কুকিদের ক্ষেত্রে খাটে না। তাদের জনগোষ্ঠীর শিকড়

মনিপুর ছাড়িয়ে অন্য রাজ্য এমনকি পাশের দেশ মিয়ানমারেও বিস্তৃত। আর দেশের সীমারেখা ঠিক করে নিলেই যে জাতির সীমারেখা টেনে দেওয়া যায় না, সেকথা বাঙালিরা তো জীবন দিয়ে বুঝতে পারছে। আবার কুকিরা একা নয়, তাঁরা মনে করেন মিজো এবং মার সম্প্রদায়ও তাঁদের স্বজাতি। একদিকে জাতিগত ঐক্য ও পারিবারিক সংযোগ এবং অপরদিকে রাজনৈতিক বিবেচনাবোধ, এই উভয়ের সমন্বয় সাধনের জন্য এক উপযোগী পথ অবলম্বন করা উচিত। আর এইসব বাস্তবতার কথা ভেবেই ভারত সরকার ১৯৭০ সালে গ্রহণ করেছিল FREE MOVEMENT REGIME. ভারত-মিয়ানমার সীমান্তে তেমন কোন বাধা তো রাখা হয়ই নি, উল্টে সীমারেখার দু'দিকেই ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত ছিল অবাধ যাতায়াতের অধিকার। আর আজ সে অধিকার জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে ভারত-মায়ানমারের ১৬৪৩ কিলোমিটার সীমান্ত বরাবর প্রাচীর তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কারণ হিসাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ' অনুপ্রবেশ' তত্বই ঝোলা থেকে বার করেছেন। এই বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যয় হবে মাত্র ৩১০০০ কোটি টাকা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা বলেছেন তা হল- মণিপুর জাতি দাঙ্গার মূল কারণ হচ্ছে এই অরক্ষিত সীমান্ত। খবর অনুযায়ী ভারত-মিয়ানমার সীমান্তে এ পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাহলে বকি রইল মাত্র ১৬১৩ কিলোমিটার। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী আমরা ধরে নিতে পারি, সীমান্ত বেড়া দিয়ে 'সুরক্ষিত' করার পর মণিপুরে আর কোন সমস্যা থাকবে না। অতএব সামান্য কয়েকটা বছর মণিপুর বাসীকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য। প্রসঙ্গত একটা তথ্য আমরা জানি যে ভারত-পাকিস্তানের ৩৩২৩ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ২০৬৪ কিলোমিটার এবং ভারত-বাংলাদেশের ৪০৯৬ কিলোমিটারের মধ্যে ৩১৮০ কিলোমিটারেই বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তবে তাতে এই দুই দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কতটা ভালো হয়েছে অথবা বৈরীতা তথা অশান্তি কতটা কমেছে তা আমরা সবাই জানি।

সীমানায় বেড়া দিলেই মনিপুর তথা উত্তর-পূর্ব ভারতে যে শান্তি আসবে না সে কথা আমরা সবাই জানি। মূল লক্ষ্য হচ্ছে কুকিদের দমন করা। পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে জো উপজাতিদের বাস। তাঁদেরও সহমর্মিতা আছে মিয়ানমারে বসবাসকারী তাঁদের সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি। নাগাল্যান্ডের নাগা জনজাতির মানুষও সার্বভৌম নাগাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে আসে নি। আবার শত শত বছর ধরে এইসব মানুষেরা এরাজ্য থেকে ও রাজ্যে, এদেশ থেকে ও দেশে অবাধে যাতায়াত করে এসেছে, বসতি স্থাপন করে এসেছে। একটি প্রাচীর গড়েই একটা জাতিকে বিভক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা আগেও বিফল হয়েছে, সে কথা আমরা জানি। এক্ষেত্রেও আমাদের সরকারের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং মানুষে-মানুষে ভালোবাসা, জাতিতে-জাতিতে বোঝাপড়া এবং দেশে-দেশে সমমর্যাদার সম্পর্ক থাকলে সবারই ভালো হয়। কিন্তু এই কথাটা শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র কিছুতেই বুঝতে চায় না। তারা বুঝতে চায় না যে, দেশে দেশে গড়ে তোলা হাজার হাজার কিলোমিটারের প্রাচীর আসলে এক সম্মিলিত প্রহসন এবং মনুষ্যত্বের প্রতি এক তীব্র বিদ্রুপবাণ।

করিমগঞ্জ থেকে শ্রীভূমি; কুযুক্তির শাক দিয়ে অপকর্মের মাছ ঢাকা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কোনও হিন্দুয়ানি ছিল না। যা ছিল তা হল বাঙালিত্ব। এই কবিতায় ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে যদি সম্মান জানাতেই হয়, তবে প্রথমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আসাম রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হবে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষার দাবিতে কবিগুরুর জন্মশতবর্ষে এগারোজন তরুণ-তরুণীকে শিলচর রেলস্টেশনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। সেই দাবি আজ পর্যন্ত মানা হয়নি। তার ওপর, বাংলাভাষী মানুষের গায়ে বহিরাগতের তকমা সেঁটে দিয়ে, বংশপরম্পরায় তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাদেরকে অন্তরীণ করে রাখার জন্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করে হঠাৎ এই 'শ্রীভূমি' নামকরণ তো প্রকারান্তরে গরু মেরে জুতো দানই। রবীন্দ্রনাথকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলাটা একটা ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

আসামে এখন আর করিমগঞ্জ নামে কোনও জেলা রইল না। গত ১৯ নভেম্বর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন, মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে শ্রীভূমি। এখন থেকে এই নামেই এই জেলা পরিচিত হবে। এতদিন করিমগঞ্জ শুধু একটি জেলার নাম ছিল না, ওই জেলার সদর শহরের নামও করিমগঞ্জ। বদরপুর থেকে আগরতলামুখী ট্রেন করিমগঞ্জের অদূরে যে স্টেশন হয়ে যায় তার নাম নিউ করিমগঞ্জ। শহরের ভেতর যে স্টেশনটি আছে তার নামও স্বভাবতই করিমগঞ্জ। সরকারিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে শুধু জেলার নামটি।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও সাধারণ জনগণের ইচ্ছা এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নকে সম্মান প্রদর্শন করে রাজ্য মন্ত্রিসভা আজ করিমগঞ্জ জেলাকে শ্রীভূমি জেলা হিসেবে নামকরণ করার অনুমতি দিয়েছে। ১০০ বছরেরও বেশি আগে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসামের আধুনিক করিমগঞ্জ জেলাকে

'শ্রীভূমি'; মা লক্ষ্মীর ভূমি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। আজ আসাম মন্ত্রিসভা আমাদের জনগণের এই দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করেছে।' পরে সরকারি প্রজ্ঞাপনে জেলা নামের সঙ্গে সঙ্গে শহরের নামও শ্রীভূমিতে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ করিমগঞ্জ জেলাকে কখনওই শ্রীভূমি নামে অভিহিত করেননি। করা সম্ভবও ছিল না। কারণ করিমগঞ্জ জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৪২ বছর পর। তাছাড়া করিমগঞ্জের নাম পরিবর্তনের দাবিতে কোনও আন্দোলন বা স্মারকপত্র পেশের কথা কেউ কস্মিনকালেও শোনেনি। আসাম রাজ্যের বা এই জেলার বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে বা পরে কখনও এই দাবি জানায়নি। করিমগঞ্জের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত কোনও সংগঠনও কখনও এমন দাবি তোলেনি। দক্ষিণ আসামের বাঙালিদের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগঠন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। তাদের কোনও সম্মেলনেও কখনও এমন দাবি উত্থাপিত হয়নি। ফলে করিমগঞ্জের নাম পরিবর্তনকে গণদাবি বলা একটি ডাহা মিথ্যা কথা। মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের আগে এমন একটি নাম পরিবর্তন কারও কল্পনাতেও ছিল না। তবে আসামের বিদ্যমান উগ্র হিন্দুত্ববাদী বাতাবরণের দরুণ মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই একটি তীব্র সংখ্যাগুরুবাদী ভাবাবেগ তৈরি হয়েছে। তথাকথিত 'মুসলিম নাম' মোছার নেশায় জেলার নাম বদলের ঘোষণা হতেই শহরের পুরসভার সাইনবোর্ডও পাল্টে গেছে। পাল্টে যাচ্ছে আরও বহু সাইনবোর্ড। যিনি গতকালও বলেছেন বা লিখেছেন করিমগঞ্জ যাচ্ছি, তিনি হঠাৎ ফেসবুকে লিখতে শুরু করলেন শ্রীভূমি যাচ্ছি। এই কথাগুলো বলার মধ্যে সরকারি ঘোষণাকে মান্যতা দিতে চাওয়ার চেয়েও প্রকট হয়ে উঠছে মুসলিমবিদ্বেষী সংখ্যাগুরুবাদী অহংবোধ। এমন একটা ভাব করা হচ্ছে যেন এতদিন কেউ বন্দুকের ডগায় সকলকে বাধ্য করেছিল করিমগঞ্জ নামটি মেনে নিতে। যেন এই নামে হিন্দুদের একটি দাসত্বশৃঙ্খল ছিল যা মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। অতএব একটি বিজয় উৎসব বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এই নাম পরিবর্তন ও তার পরের এই বিজয় উদযাপনের উল্লাসে স্বভাবতই অন্তরে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হচ্ছেন এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজ। যে করিমগঞ্জ নিয়ে এই অঞ্চলের ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের এত ভাবাবেগ, এত স্মৃতিকাতরতা এখন সেই নামটাই যে তাঁদেরকে অপমানিত করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেটা ছিল তাঁদের কাছে অকল্পনীয়। সরকারের একটি আত্মঘাতী ভেদবাদী চাল এভাবে সোল্লাসে উদযাপিত হবে এমন দুর্দিন এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে তাঁরা কখনওই ভাবেননি। অনেক মানবিক প্রতিবেশীর আচার আচরণ হঠাৎ এই নামবদল নিয়ে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

সত্যিই কি করিমগঞ্জের সঙ্গে শ্রীভূমি নামের কোনও দ্বৈরথ ছিল অতীতে? কোনওকালে করিমগঞ্জ কি সত্যিই শ্রীভূমি নামে পরিচিত ছিল? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীভূমি নামের যোগসূত্রটাই বা কোথায়? করিমগঞ্জের নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও পূর্বোল্লেখ কি আছে? এইসব প্রশ্নের উত্তর প্রায় পুরোটাই না-বোধক।

করিমগঞ্জ নামটি এসেছে একটি বাজারের সূত্রে। মহম্মদ করিম চৌধুরী নামের এক ভূম্যধিকারী এখনকার করিমগঞ্জের নটিখাল ও কুশিয়ারা নদীর সঙ্গম অঞ্চলে একটি বাজার স্থাপন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে সেই বাজার স্থানান্তরিত হয় আজকের করিমগঞ্জ শহরে। ওই বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গঞ্জটির নাম হয় করিমগঞ্জ। ১৮৮৪ সালে ৪০টি পরগণা নিয়ে সিলেট জেলার অন্তর্ভুক্ত করিমগঞ্জ মহকুমার পত্তন।

১৯৪৭ দেশভাগের সময় সিলেট জেলার পাকিস্তানভুক্তির সময়ে করিমগঞ্জ মহকুমার পুরোটাই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পরে রেডক্লিফ বাঁটোয়ারার সুবাদে করিমগঞ্জ শহর-সহ মহকুমার একটি অংশ ভারতে যুক্ত হয়। ১৮৭৪ সালে সিলেট ও কাছাড় জেলা দুটিকে যখন নবগঠিত চিফ কমিশনার-শাসিত আসাম প্রদেশে যুক্ত করা হয় তখন সিলেট ও কাছাড়কে নিয়ে তৈরি হয় সুরমাভ্যালি ডিভিশন। সেই সময় থেকে সিলেট ও কাছাড়কে সুরমা উপত্যকা বলা হত।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগ করার পরবর্তীতে অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন শিলং শহরে। এই খবর পেয়ে সিলেটের ব্রাহ্ম সমাজের গোবিন্দ নারায়ণ সিংহ মজুমদার শিলংয়ে গিয়ে কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সিলেট সফরের। তখনকার সময়ে শিলং থেকে সরাসরি মোটরযানে সিলেট যাওয়া যেত না। পাহাড়ের একটা নির্দিষ্ট পথ মানুষের ঘাড়ে নেওয়া থাপা বা বেতের আসনে বসে পাড়ি দিতে হত। রবীন্দ্রনাথ এভাবে যেতে রাজি ছিলেন না। তাই অনেকটা ঘুরপথে গুয়াহাটি থেকে ট্রেনে পাহাড়লাইনের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে বদরপুর করিমগঞ্জ কুলাউড়া হয়ে সিলেট পৌঁছেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ট্রেন করিমগঞ্জ রেলস্টেশনে পৌঁছলে কিছুক্ষণের জন্যে সেখানে যাত্রাবিরতি হয়। করিমগঞ্জে স্টেশন চত্বরেই সঙ্গীত ও নৃত্যে কবিকে সম্মান জানানো হয়। সুদীর্ঘ ট্রেনযাত্রায় সুরমা উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কবি অভিভূত হয়ে পড়েন। একই সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির মূল ভূখণ্ড থেকে এর বিযুক্তি তাঁকে ব্যথিত করে। সেই সফরে সিলেট পৌঁছে একটি শিরোনামহীন দশ লাইনের কবিতা রচনা করেন, যেখানে কবির এই অনুভূতি ব্যক্ত হয়। পুরো কবিতাটি এ-রকম;

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্যহাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিনতরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।

কবিতাটিতে পুরো সুরমা উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বাংলার মূল ভূখণ্ড থেকে তার বিচ্ছেদের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শুধুমাত্র সিলেট জেলা বা করিমগঞ্জ মহকুমার প্রসঙ্গই এখানে নেই। দ্বিতীয়ত সুরম্যভূমি সুরমা উপত্যকার সৌন্দর্য নিয়ে বিশেষণার্থে 'সুরমা' শব্দের একটি প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি 'শ্রীভূমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কবিতায়। এর সঙ্গে স্থাননামের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা বিশেষণ, বিশেষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় কোনও হিন্দুয়ানি নেই। যদি কিছু থেকে থাকে তা হল বাঙালিত্ব। রবীন্দ্রনাথ সুরমা উপত্যকার ভৌগোলিক নির্বাসন সত্ত্বেও এর চিরজীবী বাঙালিত্বের কথাই তুলে ধরেছেন। এই কবিতায় ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে যদি সম্মান জানাতেই হয়, তবে প্রথমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আসাম রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হবে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষার দাবিতে কবিগুরুর জন্মশতবর্ষে এগারোজন তরুণ-তরুণীকে শিলচর রেলস্টেশনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। সেই দাবি আজ পর্যন্ত মানা হয়নি। শুধুমাত্র আজকের বরাক উপত্যকা অঞ্চলের জন্যে যে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি জুটেছিল তাও এখন প্রতিদিন সঙ্কুচিত হচ্ছে। বিজেপি সরকারে আসার পর বরাক উপত্যকার সরকারি প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন, সরকারি চিঠিপত্রে অসমিয়া ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে সরকারি ভাষা আইনকে লঙ্ঘন করে। বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের জনগণের গণদাবি ছিল শিলচর রেলস্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'ভাষা শহিদ স্টেশন' রাখার। এই দাবিকে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদনও করেছে। আসামের বিজেপি সরকার এই গণদাবি ও একে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রদানকে উপেক্ষা করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাভাষী মানুষের গায়ে অবাঞ্ছিত বহিরাগতের তকমা সেঁটে দিয়ে, বংশপরম্পরায় তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাদেরকে অন্তরীণ করে রাখার জন্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করে হঠাৎ এই 'শ্রীভূমি' নামকরণ তো প্রকারান্তরে গরু মেরে জুতো দানই। ফলে রবীন্দ্রনাথকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলাটা একটা ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

মূল বিষয়টা হচ্ছে, আসামকে যোগী আদিত্যনাথের পথে নিয়ে যাওয়া। বুলডোজার আগেই শুরু হয়েছে। এখন নতুন সংযোজন নাম পরিবর্তন। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছুকে ধর্মের নামে বিভাজিত করার মধ্যে দিয়ে হিন্দু সংখ্যাগুরুবাদের এক মিথ্যা অহংবোধের নেশায় সমাজকে বুঁদ করে দেওয়া। অন্যদিকে, প্রতি মুহূর্তে মুসলিম সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে দেওয়া যে তোমরা এ-দেশে সম-অধিকার পাওয়ার অধিকারী নও। ইতিহাসের যে স্মারকেই তোমাদের ছোঁয়া আছে, তার সবটা মুছে দেওয়া হবে, ভেঙে দেওয়া হবে। সংখ্যাগুরু সমাজকে বোঝানো হবে, ইতিহাসের মুসলিম চরিত্র প্রত্যেকে অপরাধী, হত্যাকারী, হিন্দুবিদ্বেষী। দেশের মুসলিম সমাজ সেই অত্যাচারীদেরই অংশ। ফলে এদের যত অপমান করা যাবে, কোণঠাসা করা যাবে, অধিকারহীন করা যাবে, এমনকী লাঞ্ছনা করা যাবে ততই হিন্দুদের মর্যাদাবৃদ্ধি। হিন্দুগৌরব পুনরুদ্ধারের একমাত্র পথ মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ব্যক্ত করা।

করিমগঞ্জের নাম পরিবর্তন সারা ভারত জুড়ে চলা এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচিরই অঙ্গ। এখানে রবীন্দ্রনাথের নাম ব্যবহার হচ্ছে দুরাত্মার একটি ছল। ** মতামত ব্যক্তিগত*

- ৪ং প্লাটফর্মের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিধানসভা ভোটে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার: সঙ্গে ভোটার তালিকা ও পদ্ধতি নিয়ে নির্বাচন কমিশন গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন

সৌর বসু

মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন সম্প্রতি সমাপ্ত হলো। নির্বাচনের ফলাফলে মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, অজিত পাওয়ারের মহাযুতি জোট (শিবসেনা - শিন্ডে, বি.জে.পি. ও এন.সি.পি - অজিত পাওয়ার) জয়লাভ করেছে। ঝাড়খণ্ডে জয়লাভ করেছে ভারত জোট । পরাজিত হয়েছে বিজেপি জোট।

২০২৪ সালেই আমাদের দেশের লোকসভা নির্বাচন হয়। লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনে এন.ডি.এ তথা ভারতীয় জনতা পার্টি ভালো ফলাফল করে। হরিয়ানাতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠন করতে পারবে না। কিন্তু হরিয়ানাতে সব হিসেব - নিকেশ উল্টে দিয়ে বিজেপি অত্যন্ত অল্প ব্যবধানে হলেও কংগ্রেসকে হারিয়ে জয়লাভ করে। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনে বিজেপি পরাস্ত হয়।

সাম্প্রতিক ঝাড়খন্ড ও মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচনে এবং

উত্তর প্রদেশ উপনির্বাচনে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা উপেক্ষা করে, ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে চরম সাম্প্রদায়িক এবং মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিয়েছিল তা অত্যন্ত নিম্নরুচির এবং দেশের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপদজনক।

ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ঝাড়খন্ডে এসে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করাচ্ছে । তাদের জমি ও সম্পত্তি নিয়ে নিচ্ছে। এই অনুপ্রবেশকারী বলতে কাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কিছু নেই। বিধানসভায় কয়েকটি আসন জয়লাভ করার জন্য এ ধরনের মিথ্যা প্রচার চিন্তার অতীত। অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে একটি উদাহরণও দিতে পারেন নি। একটি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনগণকে বা ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য যখন এ ধরনের প্রচার করেন তখন তা ক্ষমার অযোগ্য। তিনি একথাও বলেন যে ঝাড়খন্ডে ক্ষমতায় এলে তারা এইসব অনুপ্রবেশকারীদের পা বেঁধে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে মার লাগাবেন। একটি দেশের সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় শাসকদের। সীমান্তে যে রক্ষী বাহিনী আছে, তাদের পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কাজ তো তিনি যে কোনও সময়ে করতে পারেন।তাহলে প্রশ্ন ওঠে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাদের দোষারোপ করছেন। এই সব কথা বলে মোদী - অমিত শাহরা নিকৃষ্ট মানের সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেন, উদ্দেশ্য মানুষকে সাম্প্রদায়িক লাইনে বিভক্ত করে ভোটকে প্রভাবিত করা। দেশের নির্বাচন কমিশনই বা কি করছিল ? এক্ষেত্রে তাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইউটিউবে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছিল একটি হিন্দু বাড়িতে হঠাৎ করে দলে দলে মহিলা ও পুরুষ ঢুকে পড়ে। তাদের পোশাকের সঙ্গে মুসলমানদের পোশাকের সাদৃশ্য আছে। তারা বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ করে দেয়। শোবার খাটের উপরে চেপে নাচ করতে থাকে। কাদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে বিজ্ঞাপনটিতে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিজ্ঞাপন টির catch line হচ্ছে

'এক ভি গোলতি সবকো পড়েগী ভারী
আব করো ভাজপাকো লোনে কী তৈয়ারী।'

অর্থাৎ একটি ভুলের জন্য তোমাদের বড় মাশুল দিতে হবে। এখন তোমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে নিয়ে আসার জন্য তৈরি থাকো। বিজ্ঞাপনটি ইউটিউবে ভাইরাল হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞাপনটি ইউটিউব থেকে মুছে ফেলার নির্দেশ দেয়। Indian Administrative Service এর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মিস্টার শুক্লা অভিযোগ করেন নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পরেও বিজ্ঞাপনটি ইউটিউবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি শুনেছেন বিজ্ঞাপনটি ইউটিউব থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব করেও ঝাড়খন্ডে বিজেপি পরাস্ত হয়। সিবিআই ও ইডি কে ব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেনকে গ্রেপ্তার করে রাখাকে সুপ্রিম কোর্ট তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। তাঁকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে ওই সব কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যূনতম সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারে নি। ঝাড়খন্ডের ২৮ টি আদিবাসী আসনের ২৭ টিতে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বে ভারত জোট জয়লাভ করে।অন্যান্য ৫৩ টি সাধারণ আসন ও তফসিলি আসনের মধ্যে ২৯ টি আসনে জিতেছে ভারত জোট।

উত্তর প্রদেশ বিধানসভা উপনির্বাচন ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মন্তব্য করেন, 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে।' এই স্লোগান প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাজ বব্বর বলেছেন, আমার জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশ এবং আমার জীবনের দুই তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্রে কেটেছে। যে মতাদর্শ 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' তে বিশ্বাসী,আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করি না। আমরা জানি উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃতি কী এবং মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্য কী। এছাড়াও ইউটিউবে দেখা গেছে মুসলমান মহিলাদের ভোটদান থেকে বিরত করার জন্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ ফোর্স তাদের রিভলবার প্রদর্শন করে ভয় দেখাচ্ছে। এ ব্যাপারেও নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে এবার ২৮৮ টি আসনের মধ্যে এনডিও জোট পেয়েছে ২৩০টি আসন। এরমধ্যে বিজেপি একাই জয় পেয়েছে ১৩২টি আসনে। একনাথ শিন্ডের দল জয়লাভ করেছে ৫৭ টি আসনে এবং অজিত পাওয়ারের এন সি পি ৪১ টি আসন পেয়েছে। এদের প্রাপ্ত ভোট ৪৮.১৬ শতাংশ। এছাড়া নির্দল ও অন্যরা পেয়েছে ৫টি আসন।

অন্যদিকে কংগ্রেস, এনসিপি (এস পি) এবং শিবসেনা (ইউ বি টি) ও অন্যান্য দের এমভিএ জোট মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। রাজ্যের ২৮৮ টি আসনের মধ্যে তাঁরা মাত্র ৫০ টি আসন জিতেছে। তাদের দলগত পরিস্থিতি শিবসেনা(উদ্ধব) ২০ টি, কংগ্রেস ১৬, এনসিপি (শারদ) ১০, পিসেন্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি ১ , সিপিআই(এম) ১ ও সমাজবাদী পার্টি ২টি আসনে জয়লাভ করেছে। প্রাপ্ত ভোট ৩৪.৩৮ শতাংশ।

মহারাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জন্য বিজেপির তীব্র প্রচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বা ভারত জোট কোনও কার্যকর প্রচার করতে পারেনি। রাহুল গান্ধী সংবিধান রক্ষা করার পক্ষে ও আদানি/ আম্বানির মতন ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টদের মোদী সরকার কিভাবে ১৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ মকুব করেছে সেই বিষয় নিয়ে প্রচার চালান।কিন্তু এই বিষয় দুটি নিয়ে মানুষের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় নি। কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনের সময় মূল্যবৃদ্ধি , বেকার সমস্যা ও অগ্নিবীর প্রকল্পের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রচার চালিয়েছিল তা ছিল এবার অনুপস্থিত। কংগ্রেস ও শরিক দলগুলির মধ্যে সমন্বয় ছিল দুর্বল।

অপরদিকে বিজেপি - শিবসেনা জোট সরকার লাডলি বহিন যোজনায় প্রত্যেক মহিলাকে মাসে ২১০০ টাকা করে দেবার যে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কিছু বকেয়া প্রদান করে তা বিরাট সংখ্যক মহিলার সমর্থন সুনিশ্চিত করে।

লোকসভা নির্বাচনের আগে যে আগ্রাসী প্রচার ভারত জোট করতে সক্ষম হয়েছিল এবার তা ছিল অনুপস্থিত। আত্মসন্তুষ্টি ও সমন্বয়ের অভাব ছিল এর জন্য দায়ী।

ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে ৮১ টি আসনের মধ্যে ভারত জোট পেয়েছে ৫৬ টি আসন। কংগ্রেস জয়লাভ করেছে ১৬ টি আসনে , ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা পেয়েছে ৩৪ টি আসন, আর জে ডি পেয়েছে ৪ টি আসন এবং সিপিআই (এম এল লিবারেশন) জয়লাভ করেছে ২ টি আসনে। ভারত জোটের প্রাপ্ত ভোট ৪৪. ৩৩ শতাংশ ভোট।

এন ডি এ জোটের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ২১ টি আসন, এল. জে.পি, এ জে এস ইউ এবং জে ডি (ইউ) পেয়েছে একটি করে আসন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের প্রাপ্ত ভোট ৩৮ শতাংশ।

মহারাষ্ট্র এবং ঝাডখন্ডের নির্বাচনের পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নিয়ে কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন অর্থনীতিবিদ পারকোলা প্রভাকর। এবারে মহারাষ্ট্রে একটি দফাতেই নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনে ফলাফল সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, নির্বাচনের দিন নির্বাচনের নির্ধারিত সময় বেলা ৫ টা অবধি ভোট পড়ে ৫৮. ২২ শতাংশ। নির্বাচনে বিধি অনুসারে বেলা পাঁচটার আগে যে সমস্ত ভোটার ভোটকেন্দ্রের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন ভোট দেবার জন্য, তাদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়। লাইনের সবথেকে শেষে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তার হাতে এক নম্বর কুপনকে ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং সর্বপ্রথমে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তার হাতে সর্বশেষ কুপনটি ধরিয়ে দেওয়া হয়। এবারের মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেছে যে , ভোট হয়েছে রাত্রি ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। রাত্রি ১১.৩০ টা অবধি ভোট প্রদান করা হয়েছে তার শতাংশ ৬৫.০২। ভোট গণনার ১২ ঘন্টা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে যে ভোট পড়েছে ৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ এই ৬ ঘন্টা ৩০ মিনিটে প্রায় ৮ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় আট শতাংশ ভোট বৃদ্ধিকে যদি আমরা সংখ্যায় পরিণত করি , তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৭৬ লক্ষ ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পূর্বে কোন নির্বাচনে এক শতাংশর বেশি ভোট কখনো বৃদ্ধি পায়নি বলেই জানা গেছে। আমরা যদি ধরে নিই একজন লোকের ভোট দান করতে এক মিনিট সময় লাগে (যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে সময় লাগে তার থেকে বেশ বেশি), সেক্ষেত্রে যদি ১০০০ জন ভোটদাতা নির্দিষ্ট সময়ের পর ভোট দেয়, তাহলে সময় লাগবে ১৬ ঘণ্টারও বেশি। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাড়ে ছ ঘন্টায় প্রায় ৭৬ লক্ষ ভোট পড়েছে।

শুধু তাই নয় কংগ্রেস থেকে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে অন্তত ৫০ টি বিধানসভায় আশ্চর্যজনক ভাবে প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৫০ হাজার করে ভোট বেড়েছে। এর মধ্যে ৪৭ টি কেন্দ্রে বিজেপির মহাদ্যুতি (এনডিএ) জোট জয়লাভ করেছে। অপরদিকে

ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোট সম্পন্ন হয়েছে দুই দফায় । প্রথম দফায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট পড়েছে ৬৪.৮৬ শতাংশ। নির্দিষ্ট সময়ের পরে রাত সাড়ে ১১ টা অবধি ভোট পড়েছে ৬৬.৪৮ শতাংশ। দ্বিতীয় দফায় নির্দিষ্ট সময় অবধি ভোট পড়েছে ৬৭.৫৯ শতাংশ এবং রাত সাড়ে ১১ টার সময় ভোট বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৮.৪৫ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে ১ % এর কিছু বেশি। ঝাড়খণ্ডের তুলনায় মহারাষ্ট্রে ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি প্রায় ৮ শতাংশ।

এবছরের হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেছে ভারতীয় জনতা পার্টি দশটা জেলায় ভালো ফল করেছে। এই দশটা জেলায় বিজেপি ৪৪ টির মধ্যে ৩৭ টি আসন জয় লাভ করে। এই জেলাগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ের পরে ১০ শতাংশ ভোট পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পাঁচকোলা জেলাতে ১০.৫২ শতাংশ ভোট পড়ে নির্দিষ্ট সময় সীমার পরে। অবশিষ্ট ১২টি জেলায় বিজেপি ৪৬ টির মধ্যে ১১ টি আসনে জয় লাভ করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা যে পরিসংখ্যান পেলাম তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে যেখানে ভোটের শতাংশ বেশি সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি বা এনডিএ র জয় লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি। পক্ষান্তরে যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের পরে ভোটদান হয়েছে এক শতাংশের মধ্যে সেখানে এন ডি এ, বা ভারতীয় জনতা পার্টির জয় লাভের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে।

উপরের পরিসংখ্যান সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনী পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারা সন্দিহান হয়ে পড়েছে, নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে। তাদের এই সন্দেহের অবসান ঘটানোর দায় নির্বাচন কমিশনের। কারণ কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে। ঝাড়খন্ড এবং মহারাষ্ট্র নির্বাচনের পরে নাগরিক ফোরাম থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন, স্মারকলিপি বা মেমোরান্ডমের কোন জবাব দেয়নি, এমনকি স্বারক লিপি প্রাপ্তির স্বীকৃতি জানায়নি বলে, করণ থাপারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে পারকোলা প্রভাকর জানান।

ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ একটি গণতান্ত্রিক দেশে, নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে, গণতন্ত্রের ভিত বিপন্ন হয়ে পড়ে। ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গণতন্ত্রের পরিসর সংকুচিত হতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কী সেই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল ?

নাগরিক স্মৃতিচারণা : কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর বাংলা

মিলন দত্ত

১

পূর্ববঙ্গের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কাজী আবদুল ওদুদ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গে চলে যাননি, পাকিস্তান সরকারের তরফে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি কলকাতাতেই থেকে যান। কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন রামমোহনপন্থী এবং গভীর রবীন্দ্রানুরাগী। রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখালিখি রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলকাতা তাঁকে মনে রাখেনি। আবার বাংলাদেশে তাঁর ছয় খণ্ডের রচনাবলী এবং অন্যান্য বই লভ্য হলেও আজ সে দেশে ইসলামি মৌলবাদের আড়ে-বহরে যে বিস্তার দেখতে পাই, তা থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে ওদুদ কতটা প্রসঙ্গহীন হয়ে পড়েছেন। বস্তুত বাংলাদেশে মুক্ত-মননের ক্ষেত্রগুলোকে যেভাবে প্রতিহত করা হয়েছে তা ওদুদের দেখা মুসলমান সমাজে নবজাগরণের স্বপ্নের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

শুরুতেই জেনে রাখা ভাল যে, এ বাংলায় মুসলমান সমাজে ওদুদকে নিয়ে আগ্রহ প্রায় নেই। অথচ ওদুদের মুসলিম সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার ঘোর সমালোচক 'মোস্তাফা চরিত' রচয়িতা মোহম্মদ আকরাম খাঁকে নিয়ে আগ্রহের অভাব দেখি না। কাজী আবদুল ওদুদকে আমাদের এই বিস্মৃতি তো আগ্রহের অভাব থেকেই।

মুসলমান সমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা আর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনা করতে গিয়ে ওদুদকে সারাটা জীবন সইতে হয়েছে লাঞ্ছনা; তাঁর নিজের সমাজ থেকে তো বটেই বাইরে থেকেও। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চিনেছিলেন তাঁকে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বিভীষিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ওদুদকে দু'কূলের সেতু হিসেবে দেখেছিলেন। ১৯৩৫ সালে কবির আমন্ত্রণে ওদুদ বিশ্বভারতীতে 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' বিষয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন। সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতামালা পরে বই হয়ে প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী থেকে, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সমেত। আজ সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস আর অসম্প্রীতি গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, বাংলাও বাদ নেই। এই সংকটের সময়ে তাঁর লেখাগুলো অত্যম্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক জানাবোঝা বাড়লে অবস্থার আরও একটু উন্নতি হতে পারে, এমনই মনে করতেন ওদুদ। সেই জানাবোঝার অভাব এখনও অনেকটাই একই রকম রয়ে গিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সম্পর্কের সেই টানা-পোড়েন বেড়েছে বই কমেনি। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান চর্চার ক্ষেত্রে এখন কাজী আবদুল ওদুদ তাই আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। গত শতাব্দির ত্রিশের দশকে যে কাজ ওদুদ শুরু করেছিলেন, প্রায় তিন প্রজন্ম পার করে নতুন শতাব্দির এক চতুর্থাংশ পেরিয়ে এসে দেখছি সে কাজ অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। তাঁরা যে যাত্রার সূচনা করেছিলেন সে পথে অন্তহীন হেঁটে চলেছি আমরা। এখন একাধারে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান আর তার পাশাপাশি মুসলমান মৌলবাদীদের বাড়াবাড়ির ফলে পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো হয়েছে যে, কাজটা এখন সাংঘাতির রকমের কঠিন হয়ে পড়েছে। চল্লিশের দশকে বরং কাজটা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। আগেও ছিল, কিন্তু দেশভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দু-মুসলমানে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে বিস্তর। মুসলমানের সমাজ ও তার মন-মানসিকতা জানার প্রশ্নে হিন্দুর অজ্ঞতা বেড়েছে বই কমেনি। মুসলমানকে জানা আর বোঝার ব্যাপারে তার অনীহা সীমাহীন। মুসলমানের তুলনায় সে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে, এই অহমিকাই হিন্দুর অজ্ঞতাকে আরও বাড়িয়েছে। হিন্দু তার অহমিকা নিয়ে দূরে থেকেছে, আর সংখ্যালঘুত্বের অভিমানে মুসলমানও দূরত্ব বাড়িয়েছে ক্রমাগত। এই দূরত্ব কমিয়ে দুই সম্প্রদায় পরস্পরের কাছাকাছি এসে কীভাবে সুপ্রতিবেশীর মতো বাস করতে পারে, সেই ভাবনাচিন্তা, সেই চেষ্টাও তো চলছে অনেক দিন ধরেই। বলা যেতে পারে ওদুদদ ছিলেন সেই পথের অগ্রণী পরিব্রাজক।

বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে যে কোনও রকম চর্চার ক্ষেত্রে এখনও কাজী আবদুল ওদুদ তাই আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। সেই প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি বেড়ে যায়, যখন দেখি তাঁর অসীম আগ্রহ মুসলমান সমাজের ভিতরকার সংস্কারে। বস্তুত ওদুদ মুসলমান সমাজে যে নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতেন, সেই দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখায় ওদুদ ছিলেন নজরুলের সঙ্গী। তুরস্কের সমাজ-সংস্কারক মুস্তাফা কামালের আদর্শ তাঁদের চোখে সেই স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিল। ১৩২৮ সালে 'ধূমকেতু' পত্রে নজরুল 'কামাল' নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একই বছর মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'কামাল পাশা'। প্রায় একই সময়ে ওদুদ লিখেছিলেন 'মুস্তাফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'। জীবনের ওপর প্রাচীন শাস্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ওদুদ মানতেন না। তিনি বলতেন, তার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে মানববুদ্ধির অধিকার। এ সাধনা তাঁর অনেক দিনের। ওই প্রবন্ধে ওদুদ লিখেছেন, 'মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গতানুগতিকতাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে নব সৃষ্টির আয়োজন ও সম্ভাবনা দেখিয়ে, মুসলমান সমাজের বুকে কামাল যে সত্যকার আঘাত দিয়েছেন, আশা করা যায়, সেই আঘাতেই আমাদের শতাব্দীর মোহ-নিদ্রার অবসান হবে।খ কামালের প্রদত্ত এই আঘাতেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো; সত্যকার জীবন কি, জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি।'

মুসলমান সমাজে একটা নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতেন ওদুদ।

ঈশ্বরের নামে প্রচারিত যে সব বিধি-বিধান জীবনে উন্নতির প্রতিবন্ধক, সেগুলো বর্জন করাই কাম্য মনে করতেন তিনি। অন্য দিকে ধর্মপ্রাণ ওদুদ কোরান অনুবাদ করেছেন, লিখেছেন হজরত মুহাম্মদের জীবনী। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'ওদুদ সাহেব ইসলাম ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন এবং ইসলামের মৌলিক গ্রন্থ কোরআন-এর একটি সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য বাঙ্গালা অনুবাদও করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আমি তাঁহাকে সাধুবাদ জানাই।'

১৯২৬ সালে ঢাকায় কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদ মিলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ওদুদ ছিলেন সেই সংগঠনে অগ্রগণ্য। ওদুদ ছাড়াও ওই দলে ছিলেন আবুল হোসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮), মোতাহার হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), মোহম্মদ কাশেম (১৯০৫-১৯৫৭) প্রমুখ। তাঁদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। আবদুল কাদিরের অভিমত, 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন এ দেশে প্রায় ততখানিই কাজই করেছে, যতখানি কাজ করেছিল ১৮২৮ সালে কলকাতায় হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'। কাজী আবদুল ওদুদের জীবনীকার আবদুল কাদিরের এই অভিমতকে হয়তো কারও একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকে ঢাকার সমসাময়িক মুক্তিকামী আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান এতটাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর ওদুদ বলেছেন, 'বাংলার নবজাগরণের একটি অপেক্ষাকৃত-অল্প-পরিসর কিন্তু বেগবান ধারা যে এই দল (মুসলিম সাহিত্য সমাজ) বাংলার মুসলমানের মধ্যে অল্প কিছু কালের জন্য প্রবাহিত করতে পেরেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।' মুক্ত বুদ্ধিকে তাঁরা ধর্মের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। দেশভাগের পরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমানের যে নতুন একটা মুক্তমনের সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করল তাকে ওদুদদের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনেরও উত্তরাধিকার বলা যেতে পারে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের ধারায় কাজী আবদুল ওদুদের প্রধান পরিচয় চিন্তাশীল ও মননশীল লেখক হিসেবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কথাশিল্পী, সংগঠক, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, চিন্তানায়ক, সাময়িকপত্রের সম্পাদক, অনুবাদক, অভিধানপ্রণেতা আরও অনেক কিছু। তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-এর তাত্ত্বিক এবং সংগঠকও ছিলেন।

ওদুদ জানিয়েছেন, 'এই 'সাহিত্য সমাজ' পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে পেরেছিল তিন বছর। এর প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে নজরুল যোগ দিয়েছিলেন এবং এর আদর্শ ও আবেদনের সার্থকতা উপলব্ধি করে উল্লসিত হয়েছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পরে এর সাধারণ ও বার্ষিক সব অধিবেশনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম হলে' নিষিদ্ধ হয়। অভিযোগ উঠেছিল যে এই সাহিত্য সমাজ মুসলমান ধর্ম বিরোধী।' কেমন ভাবে ধর্ম বিরোধিতা করেছেন সাহিত্য সমাজের সদস্যরা? এঁরা নিজের নিজেদের 'ইয়াং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অনুসারী মনে করলেও উনিশ শতকের সেই নব্য যুবকেরা হিন্দু ধর্মকেই যেভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিল, সাহিত্য সমাজের সদস্যরা তো তা করেনইনি, বরং তাঁরা ছিলেন ভীষণ রকমের ধর্মানুবর্তী। ওই সমাজের এক সদস্য আবুল হোসেন বলেছিলেন, হযরত মোহম্মদের একটি বিখ্যাত বাণী হচ্ছে 'তাখাল্লুকু বি আখলাকিল্লাহ্';আল্লার গুণাবলীতে ভূষিত হও। আল্লার গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার অর্থ অনন্ত সদগুণে ভূষিত হওয়া, কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই; সে হজরত মোহম্মদের চেয়েও বড় হতে পারে।' আর আবদুল ওদুদ বলেছিলেন, 'বুদ্ধির বিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়াখ তাঁরও প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায়, এবং সেই অধিকারে প্রয়োজন হলে তাঁকে অতিক্রম করায়।' এই ধরনের প্রচারের জন্য তাঁদের 'ঢাকার সাধারণ ও পদস্থ মুসলমানদের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল'। বিশ্বভারতীতে দেওয়া তাঁর ছ'টি ভাষণের সংকলন 'বাংলার নবজাগরণ'-এ বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই অধ্যায়টির। কেন এই সাহিত্য সমাজকে এহেন প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হল তার মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা বাংলার বিশিষ্ট অধ্যাপক খন্দকার সিরাজুল হক তাঁর বইয়ে (মুসলিম সাহিত্য সমাজ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম। বাংলা একাডেমি। ঢাকা ১৯৮৪) বলেছেন, 'এই নতুন চিন্তাধারা বাংলার মুসলমানগণকে সচকিত, চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাদের অনেকের কাছেই জ্ঞানের এই তীব্র আলোকচ্ছটা একটা উৎপাত বলে মনে হয়েছিল।খ সেকালে বাংলা তন্দাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজে এই কারণেই 'সাহিত্য সমাজ'এর স্বাধীন চিন্তা সহজে স্বীকৃতি পায়নি।'

(পরের সংখ্যায়)

‘ধ্রুপদী ভাষা’ বাংলা- তকমার তাৎপর্য

মজিবুর রহমান

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাষা একটি সুবৃহৎ বিষয়। বিশ্বজুড়ে ভাষা নিয়ে নিরন্তর চর্চা ও গবেষণা চলছে। মনে করা হয় যে, দশ হাজার বছর আগে মানুষের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ আর ভাষার সংখ্যা ছিল দশ হাজার।ভাষা গোষ্ঠী বা পরিবারও ছিল শতাধিক। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে জনসংখ্যা তত বেড়েছে আর ভাষার সংখ্যা কমেছে। আজ বিশ্বে জনসংখ্যা আটশো কোটির বেশি কিন্তু ভাষার সংখ্যা আট হাজারের কম। অরণ্য কেটে ও জলাশয় ভরাট করে মানুষ তার নতুন বসতি নির্মাণ করছে আর হরফ না থাকার কারণে অনেক ভাষা অবলুপ্ত হচ্ছে। বিশ্বের সিংহভাগ সম্পদ যেমন মুষ্টিমেয় মানুষ কুক্ষিগত করেছে তেমনি মাত্র দশটি ভাষা বিশ্বের অর্ধেক মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর একশোটি ভাষাতে ৯৫ শতাংশ বিশ্ববাসীর ভাষাগত কার্যাবলী সুসম্পন্ন হচ্ছে।ভাষাকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্কর বিতর্ক সৃষ্টির কারণে বহুবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। একটা ভাষা আন্দোলনকে সফলভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হতেও দেখা গেছে আমাদের এই উপমহাদেশে।পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন দেশ বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে।

‘ধ্রুপদ’ শব্দটি এসেছে ‘ধ্রুবপদ’ শব্দবন্ধ থেকে। ‘ধ্রুব’-এর অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয় আর ‘পদ’ হল বাণী বা কথা। ‘ধ্রুপদী’ দ্বারা বুঝানো হয় এমন কোনো বিষয়কে যা অত্যুৎকৃষ্ট, অভিজাত, গুরুগম্ভীর ও প্রাচীন। বাংলা ভাষায় ‘ধ্রুপদী’র আরেকটি সমার্থক শব্দ হিসেবে ‘শাস্ত্রীয়’ ও ইংরেজিতে ‘ক্লাসিক্যাল’ ব্যবহার করা হয়। সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে ধ্রুপদী শব্দটির বহুল ব্যবহার রয়েছে। গভীর ঐতিহাসিক পটভূমি, সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং অনন্য সাংস্কৃতিক পরম্পরা ছাড়া কোনো ভাষা ধ্রুপদী ভাষার দাবিদার হতে পারে না। অনেক আধুনিক ভাষা নতুন শব্দ সৃষ্টির জন্য তার নিকটবর্তী ধ্রুপদী ভাষা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তিনটি প্রধান অভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা হল গ্রীক, ল্যাটিন ও আরবি। গ্রীক ভাষার প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো লিখিত রেকর্ড রয়েছে। হোমারের (জীবনকাল- খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) মহাকাব্য ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’ এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের অনেক মৌলিক গ্রন্থ এই ভাষায় রচিত হয়েছে। ইতালি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত বহু সংখ্যক ইংরেজি শব্দের ল্যাটিন অনুষঙ্গ রয়েছে। তবে ধ্রুপদী ল্যাটিনকে বর্তমানে একটি ‘মৃত ভাষা’ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি আর পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্যবহার করা হয় না। ইসলামের আবির্ভাবের ঠিক আগের যুগে আরব উপদ্বীপে সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য আরবির উৎপত্তি ঘটে। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান আরবি ভাষায় রচিত। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞান, দর্শন, কূটনীতি ও সংস্কৃতির সার্বজনীন ভাষা ছিল আরবি। এটি বর্তমান বিশ্বের অন্তত আঠাশটি রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা। জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষাও বটে। তবে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা ইংরেজি ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

ভারতে প্রায় হাজার খানেক ভাষার অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে সচল ভাষার সংখ্যা তিনশো মতো। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রবর্তন করার সময় কোনো ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি। অষ্টম তফশিলে ১৪টি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলোকে বলা হয় ‘অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস’ বা সরকারি ভাষাসমূহ। ওই ১৪টি ভাষা হল- (১) অসমীয়া, (২) বাংলা, (৩) গুজরাটি, (৪) হিন্দি, (৫) কন্নড়, (৬) কাশ্মীরি, (৭) মালয়ালম, (৮) মারাঠি, (৯) ওড়িয়া, (১০) পাঞ্জাবি, (১১) সংস্কৃত, (১২) তামিল, (১৩) তেলেগু ও (১৪) উর্দু। এর মধ্যে হিন্দিকে জাতীয় স্তরের সরকারি ভাষা ঘোষণা করা হয়। রাজ্যগুলোকে তাদের পছন্দমত এক বা একাধিক ভাষাকে সরকারি ভাষা করার অধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৯২ সালে কোঙ্কনী, মণিপুরী, নেপালি ও সিন্ধি এবং ২০০৪ সালে বোড়ো, ডোগরি, মৈথিলী ও সাঁওতালি- এই ৮টি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে যুক্ত করা হয়। বিগত বিশ বছরে আর কোনো ভাষাকে এই তালিকায় সংযোজন করা হয়নি। অর্থাৎ, দেশে এখন মোট ২২টি সরকারি ভাষা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অষ্টম তফশিলে রাখা না হলেও জাতীয় স্তরে এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার বাড়ছে বৈ কমছে না।

ভারতে সরকারি ভাবে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টির সূচনা হয় ২০০৪ সালে। ওই বছরে ভারত সরকার কোনো ভাষার ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য নিম্নরূপ মানদণ্ড নির্ধারণ করেঃ

(১) ভাষাটির লিপিবদ্ধ ইতিহাস বা প্রাচীনতম নথির বয়স হাজার বছরের বেশি হতে হবে।

(২) ভাষাটির আদি সাহিত্যের একটি নমুনা থাকতে হবে যা মূল্যবান ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) ভাষাটির সাহিত্যিক পরম্পরা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক হতে হবে।

২০০৪ সালের মানদণ্ড অনুযায়ী দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর সদস্য তামিল প্রথম ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পায়। এটি তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির সরকারি ভাষা।তামিল ভাষার উদ্ভবকাল আনুমানিক ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব। ২০০৫ সালে মানদণ্ড পুনর্নির্ধারণ করা হয়। প্রথম শর্তে পরিবর্তন এনে বলা হয় যে, ভাষাটির সবচেয়ে পুরনো নথির বয়স ১৫০০-২০০০ বছর হতে হবে এবং চতুর্থ শর্ত

সংযোজন করে বলা হয়, ধ্রুপদী ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষার ফারাক থাকতে পারে কিংবা সেই ধ্রুপদী ভাষা ও তার পরবর্তী রূপ বা শাখার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারে। ২০০৫ সালে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সদস্য সংস্কৃতকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম নথি 'বেদ' আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত। সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য 'রামায়ণ' খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও 'মহাভারত' খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত। সংস্কৃত ভারতের কোনো রাজ্যের সরকারি ভাষা নয় এবং বর্তমানে এটিকে ল্যাটিনের মতোই একটি মৃত ভাষা মনে করা হয় কারণ ধর্মাচরণে মন্ত্রপাঠে এর ব্যবহার থাকলেও কোনো জনগোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলে না। ২০০৫ সালের মানদণ্ড অনুসারেই ২০০৮ সালে তেলেগু ও কন্নড়, ২০১৩ সালে মালয়ালম এবং ২০১৪ সালে ওড়িয়া ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পায়। বিগত এক দশক ধরে ভারতে ধ্রুপদী ভাষার সংখ্যা ছিল ৬টি। ২০২৪ সালে পূর্বোক্ত মানদণ্ডের তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ ধ্রুপদী ভাষায় সাহিত্য চর্চার ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে মৌলিক হওয়ার ধারণাটি পরিত্যাগ করা হয়। নতুন মানদণ্ডের ভিত্তিতে অসমীয়া, বাংলা, মারাঠি, পালি ও প্রাকৃত- এই পাঁচটিকে এবছর ৩রা অক্টোবর ধ্রুপদী ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে পালি ও প্রাকৃত অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সংস্কৃতের মতোই এই ভাষা দুটো এখন মৃত ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয়। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজির মতোই উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা হিন্দি ধ্রুপদী ভাষার তালিকাভুক্ত হতে পারেনি।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্যতম সেরা সদস্য বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার তকমা পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের নিয়ে গঠিত পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে ২২০০ পৃষ্ঠার 'দাবি পত্র' রচনা করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য উদ্ধার করা হয়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হাজার বছরের পুরনো 'চর্যাপদ'-এর কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু নতুন গবেষণায় অষ্টম শতকে রচিত একটি সংস্কৃত-চিনা অভিধানে ৫০টির বেশি বাংলা শব্দের সন্ধান পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শিলালিপিতে বাংলা বর্ণ মিলেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য, মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ওই উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়া মহাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে ১৯৯২ সালে অস্কার পান সত্যজিৎ রায়। ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেন, ২০০৬ সালে শান্তিতে মুহাম্মদ ইউনূস এবং ২০১৯ সালে আরেকবার অর্থনীতিতে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার বিজয়ী এই মানুষগুলোর মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষার জন্য আত্মবিসর্জনের স্বীকৃতিতে ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সূচনা হয়েছে। বাংলাদেশ বাংলা ভাষা নিয়ে অসাধারণ কাজ করে চলেছে।সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলায় সর্বাধিক সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলার বুকে। স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছে অথচ কিন্তু দু'চারটে পদ্য খেলেনি অথবা আবৃত্তি-পাঠ করেনি এমন বাঙালির দেখা মেলা ভার।

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি লাভের সুবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বাংলা ভাষার জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। যেমন, (১) বাংলার প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রাচীন গ্রন্থগুলো ডিজিটাল করা হবে। (২) বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ ও প্রকাশনা বৃদ্ধি পাবে। (৩) প্রতি বছর বাংলা ভাষার দু'জন বিশেষজ্ঞকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হবে। (৪) বাংলা ভাষা চর্চার জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। (৫) দেশের প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হবে। (৬) বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধির কারণে কিছু নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির আরও দায়িত্ব পালন দাবি করে।সেই দায়িত্ব পালন না করলে বাংলা ভাষার গরিমা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। একটা সৌধ যতই সুগঠিত ও শক্তিশালী হোক না কেন ঠিকমতো ব্যবহার ও নিয়মিত দেখভালের অভাবে তা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির মনোভাবে সাম্প্রতিক সময়ে একটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার গুরুত্ব উদ্বেগজনক মাত্রায় হ্রাস পাচ্ছে। আর্থিক সামর্থ্য সম্পন্ন বাঙালিরা তাদের সন্তানদেরকে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের বদলে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করছে। তারা সন্তানদের বাংলা শিখিয়ে 'বোকা' না করে ইংরেজি শিখিয়ে 'স্মার্ট' করতে চাইছে! বাংলা ভাষায় চরম অজ্ঞতা প্রকাশ করে পরম আনন্দ পাচ্ছে! এসব করে কতজন সফল হচ্ছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে এটা একটা আত্মঘাতী প্রবণতা। কথোপকথনে ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে খিচুড়ি-বাংলা ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলা বানান-বিধির অবস্থা খুব খারাপ। যার যা মনে হচ্ছে সে তাই লিখছে! সবই ঠিক! বিধি বাঁধন হারা হলে তো মুশকিল! সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাংলা ভাষা আক্রান্ত হচ্ছে। মুসলিমবাদীরা বাংলার বদলে আরবি ও উর্দুকে আপন করতে চাইছে। হিন্দুত্ববাদীরা 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান' স্লোগানের সমর্থনে হিন্দিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা ভাষার জন্য অনেক কিছু করার

রয়েছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া আজকের আর্থ-সামাজিক জটিলতার যুগে একটা ভাষার সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে প্রশাসনিক কাগজপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করা দরকার। সরকারকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংবিধান ও আইন বিষয়ক বইপত্র বাংলায় অনুবাদ করার উদ্যোগ নিতে হবে। মাধ্যমিক পর্যন্ত হিন্দি, ইংরেজি, সাঁওতালি, নেপালি সব মাধ্যমেই অন্যতম বিষয় হিসেবে বাংলা আবশ্যিক করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নাম এবং বিজ্ঞাপন বা প্রচারের জন্য ব্যবহৃত ব্যানার ও হোর্ডিং বাংলা বর্ণে লেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার ব্যাপারে সকলকে যত্নবান হতে হবে।২১শে ফেব্রুয়ারি ও ১৯শে মে উদযাপন আরও ফলপ্রসূ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালির বাঙালিত্ব বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর, বাঙালিত্ব ছাড়া বাঙালির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

শিক্ষাসত্র শতবর্ষে

মহম্মদ মোজহারুল হামিদ

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষে পদার্পণ একটি গৌরবের বিষয়। এই অতি দীর্ঘ সময় ধরে একটি একটি করে স্বর্ণময় অধ্যায় জুড়ে জুড়ে যে দীর্ঘ মালিকার সৃষ্টি তার প্রতিটি পুষ্পে যে বর্ণময় সুখস্মৃতির গন্ধ ভেসে আসে তাতেই এক সফল স্রষ্টার স্বপ্নেরা খেলা করে।

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বিদ্যালয় 'শিক্ষাসত্র' শতবর্ষে পা রেখেছে। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় (বর্তমান পাঠভবন) প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এক কবি যিনি শিশুকে প্রকৃতির কোলে প্রকৃত শিক্ষা দিতে এমন এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন যেখানে থাকবে না প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়। কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয় প্রাচীন তপোবনের গুরুকুল শিক্ষার আদলে সেখানে শিশুকে জীবনের পাঠ দেওয়া শুরু হল। কিন্তু প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই নানান বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ আবার একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প করলেন। বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অভিভাবকত্বে ১৯২৪ সালের ১ জুলাই শান্তিনিকেতনেই প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর দ্বিতীয় বিদ্যালয় শিক্ষাসত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে বড়ই যত্নশীল ও সংবেদনশীল ছিলেন। তাঁর রচনাকে যথোপযুক্ত রূপ ও মাত্রা দিতে তিনি যেভাবে কাটাকুটি করতেন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটল। প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে একজন নিষ্ঠাবান পরীক্ষাকর্মীর মতো নিজ শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন করে এই দ্বিতীয় বিদ্যালয়টিকে পরিপূর্ণতা দান করলেন তিনি।

শিক্ষাসত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুবই আশাবাদী ছিলেন। তাঁর কথায়, 'আমি আর একটি ইস্কুল খুলি। সেটি গ্রামের যাদের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাদের জন্য। এই অপর স্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছি। অনতিকাল পরেই এই গ্রামের স্কুলটি সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে...'

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মাত্র দু'বছর শিক্ষাসত্রের সার্থক রূপকার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য অভিভাবকত্বের সন্ধানে এবং অন্যান্য পরিস্থিতিগত অসুবিধার কারণে ১৯২৭ সালে শিক্ষাসত্রকে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানান্তরিত শিক্ষাসত্রকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র শ্রীনিকেতনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে এলমহার্স্টকে লেখা একটি পত্রে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি লেখেন, 'আমি শিক্ষাসত্রের উপর যে আদর্শভার ন্যস্ত করেছি সে সম্বন্ধে উৎসুক আছি যাতে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনের মূল উদ্দেশ্যটি সার্থক করে তুলতে পারে। সেটি হ'ল ছাত্রদের সর্বপ্রকার মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করা।'

শিক্ষাসত্র কেবল একটি বিদ্যালয় নয়, শিক্ষাসত্র শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার এমন এক ফসল, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সম্পূর্ণ সুযোগ করে দিয়ে কর্ম অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা, প্রয়োগধর্মী সাধারণ শিক্ষাদানের পাশাপাশি উৎপাদনধর্মী শিক্ষায় নিপুণ করা এবং সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সামর্থ ও সক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করা।

সাহিত্যচর্চার পরেই রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন এবং সময় ব্যয় করেছেন তা হ'ল শিক্ষা। এর পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করি তাঁর বাল্যকালের বিদ্যালয় জীবনের অতৃপ্তি বোধ এবং পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর গভীর অনাস্থা। শিক্ষা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সেই সময় আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে তৎকালীন সরকার-পক্ষের অনেক সুবিধা হলেও সর্বস্তরের ভারতীয়দের স্বদেশাভিমান জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এমন কি বৌদ্ধিক জ্ঞানের বাইরেও যে জীবনের শিক্ষা তাকে সম্পূর্ণতা

দিতে অপারগ। তাই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাধারার প্রতি আস্থা রেখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প করে প্রথমে পাঠভবন ও পরে শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষাসত্র দেখতে দেখতে একশোটি বছর অতিক্রম করলেও মানুষের মধ্যে এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে কৌতূহলের অভাব এবং বিদ্যালয়টিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার অনীহা খুবই বেদনাদায়ক। শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটি ষোলো-আনা সত্য যে বর্তমান শিক্ষাসত্র তথা বিশ্বভারতীর অধিকাংশ শিক্ষক, কর্মীবন্ধু ও ছাত্রছাত্রী শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং এর গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জানেন না এবং জানার আগ্রহও দেখান না। শিক্ষাসত্র তো কেবল একটি চাকুরীক্ষেত্র নয়, নিছক ডিগ্রি ও অর্থোপার্জনের জন্য শিক্ষাসত্র তৈরী হয়নি। শিক্ষাসত্র রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার একটি আয়না। যে আয়নায় তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিলেন। সেই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা, অন্তরের স্বাধীনতা, সমস্ত কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা এবং ধর্মের স্বাধীনতা। পরাধীন ভারতবর্ষের যে করুণ কান্না এক কবির অন্তরে প্রবেশ করেছিল, তাঁকে ব্যথিত করেছিল সেই কান্নাকে রোধ করার অভিপ্রায়েই রবীন্দ্রনাথ যখন একটি সঠিক পথ অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন তখনই তিনি উপলব্ধি করেন, আমরা যে দিনের পর দিন অন্যের দাসত্ব করে দিনপাত করছি তার মূলে আছে আমাদের ঐক্যের অভাব, শিক্ষার অভাব। আমরা অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন। আমাদের প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি আর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আমাদের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। তাই দরকার প্রকৃত শিকক্ষা যা আমাদের প্রথমে অন্তরের মুক্তি ঘটাবে। আর অন্তরের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হলেই আমরা স্বাধীনতার দিকে পদক্ষেপ করতে পারব। ভারতবর্ষ গ্রামে গাঁথা দেশ। গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলে তারা নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝে নিতে পারবে। তখন কেবল অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজের কর্মপণ নিজেই গড়ে নিতে সক্ষম হবে। এই স্বাবলম্বন শিক্ষার লক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন। তাই শিক্ষাসত্র যেন এক জাতীয়তাবাদী কবির স্বদেশ প্রেমের বলিষ্ঠ প্রকাশ।

(লেখক পাঠভবন ও বিশ্বভারতী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তনী। বর্তমান লেখাটি 'শতবর্ষের আলোয় কবির ইস্কুল শিক্ষাসত্র' শীর্ষক গ্রন্থের 'প্রাক-কথন'। এ বইয়ের তিনি অন্যতম সম্পাদক)।

আদানির মুখোশ মোদী বিপাকে - তাই সংসদে আলোচনা হতে দিচ্ছেন না

অমিতাভ সিংহ

আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস ও সিকিওরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের যে অভিযোগ আদানী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তা শুধু দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করছে তাই নয়, বিশ্বের বাজারে ভারতীয়দের এক প্রতারক হিসাবে প্রতিপন্ন করার সুযোগ করে দিচ্ছে। সবাই জানে এই গোষ্ঠী নিছক এক ব্যবসায়ী থেকে হঠাৎ শিল্পপতি বনে যাওয়া কেউ নয়,এরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মানসপুত্র, যাদের গত দশ বছরে মোদী একের পর এক অন্যায় সুবিধা দিয়ে বিশ্বের ধনী তালিকায় তিন নম্বরে প্রতিষ্ঠা করেছে। মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে যখনই কোন দেশ সফরে গেছেন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন গৌতম আদানিকে। অবধারিতভাবে কিছুদিনের মধ্যেই সেইদেশে এক বা একাধিক ব্যবসার বরাত হস্তগত করেছে আদানিগোষ্ঠী। স্টেট ব্যাঙ্কসহ বিভিন্ন ব্যাঙ্ক তাকে ঋণ দিয়েছে অকাতরে। মোদীর চাপে স্টেট ব্যাঙ্ক, এলআইসিসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা আদানিগোষ্ঠীর শেয়ারও কিনতে বাধ্য হয়েছে।

আদানি গোষ্ঠী আবার মুম্বাই আমেদাবাদ, জয়পুর, লখনৌ, তিরুবনন্তপুরম, ম্যাঙ্গালোর, গৌহাটি বিমানবন্দর পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। অথচ কোনদিনই তাদের বিমানবন্দর পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল না। বৈদেশিক দপ্তর ও নীতি আয়োগের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দেশের কৌশলগত ও অবস্থানগত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মুম্বাই বিমানবন্দর তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেসময় যারা সেই বিমানবন্দরটির পরিচালনা করত সেই জিভি গোষ্ঠীকে সরকারি স্তরে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক সমুদ্রবন্দর পরিচালনার ভার এদের হাতে দিয়েছে মোদী সরকার। মহারাষ্ট্রের ধারাভি বস্তি পূণনির্মাণ প্রকল্পের জন্য মুম্বাই এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৪০ হেক্টর জমি কমদামে হস্তগত করে এই গোষ্ঠী। কয়েকমাস আগেই এরাই ব্যাঙ্কের বাষট্টি হাজার কোটি টাকার ঋণ ষোল হাজার কোটিতে রফা করে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায়। বস্তুত দেশের ভূ-কৌশলগত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি শক্তিশালী হাত হয়ে উঠেছে মোদীবাবুর দাক্ষিণ্যে।

গত কয়েকবছর ধরেই এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে শুধু কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী যে সুর চড়াচ্ছিলেন তাই নয়, বহু সময়ে আদানিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে অভিযোগ উঠেছে।গত বছর আমেরিকার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের সর্ববৃহৎ কর্পোরেট জালিয়াতির তকমা পেয়েছে আদানিদের কীর্তি। রিপোর্টে রয়েছে বিদেশে অফসোর কোম্পানিখুলে

নিজেদের গোষ্ঠীর সংস্থায় তা বিনিয়োগ করে কিভাবে তারা দেশের মানুষকে ঠকিয়ে কৃত্রিমভাবে নিজেদের শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে লগ্নীকারীদের প্রলুব্ধ করে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ লোকসান করেছিল তার তথ্য রয়েছে।

এরপর হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ সামনে আনল দেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচের সহায়তায় কিভাবে আদানিগোষ্ঠী একের পর এক নিয়ম ভেঙেছে। সেবির সদস্য ও চেয়ারপার্সন নিয়োগ করেছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। এবারের সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসসহ বিরোধীরা এই বিষয় উত্থাপন করে সরকারপক্ষ থেকে জবাব চাইবেন ও মাধবীর পদত্যাগের জন্য চাপ দেবেন বলে ঠিক করা হয়েছিল। পুরো সপ্তাহ আদানি নাম শুনলেই স্পীকার ওম বিড়লা বা ডেপুটি স্পীকার ধনকর সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশন মুলতুবী করে দিচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে আদানিদের এই জালিয়াতির পেছনে কে বা কারা আছে। কাদের মস্তিষ্ক কাজ করছে। আদানির ব্যাক্তিগত বিমানে সারা দেশে নির্বাচনী সফর বা একই বিমানে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে আসা বা তার অর্থে একের পর এক নির্বাচিত রাজ্য সরকার ভাঙা,নির্বাচনে বিপুল টাকা খরচ করা থেকে দেশের প্রায় সমস্ত মিডিয়া হাউস কিনে নিজেদের পক্ষে ক্রমাগত মিথ্যে প্রচার চালিয়ে যাওয়াতে আদানিদের যে প্রধান ভূমিকা তা কি করে অস্বীকার করবে মোদী অ্যান্ড কোম্পানি। তাই আজ সমস্যায় পড়েছেন খোদ মোদী ও বিজেপি দল।তাই আদানিদের প্রসংগ উঠলেই বিজেপির ছোট বড় মাঝারি নেতারা ক্রোধে লাফিয়ে উঠছেন।এটা নাকি পার্টি উইথ ডিফারেন্স। ঠিকই বলেছিলেন তারা। এই গণতন্ত্র হত্যা,মিডিয়া হাউস কিনে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর চাপা দেওয়ার চেষ্টা,জনগনের রায় বিপক্ষে গেলেও টাকা খরচ করে সরকার ভাঙা, জালিয়াতদের আরাধ্য দেবতার আসনে বসানো এদেশে বিজেপি ছাড়া আর কোন দল করেছে?

ইতিমধ্যেই আদানিদের আরেকটি মহান কীর্তি প্রকাশ পেয়েছে যার ফলে দেশের সম্মান তো ভুলুণ্ঠিত হয়েছেই, এমনকি গৌতম আদানিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারির দাবীও উঠেছে কংগ্রেসের তরফে। তারা আমেরিকায় ঢুকলেই গ্রেপ্তার হবেন বলে জানা গেছে। বাড়ীতে সমন চলে গেছে বলে খবরে প্রকাশ। এবারে আমেরিকার জনগণের সাথে প্রতারণার অভিযোগ।

কি সেই অভিযোগ? আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস একটি ৫৪ পাতার রিপোর্টে অভিযোগ করেছে গৌতম আদানি ও তার ভাইপো সাগর আদানি ও সহযোগীরা ২৬৫ মিলিয়ন বা ২৬.৫ কোটি ডলার বা প্রায় ২২৩৬ কোটি টাকা উৎকোচ বা ঘুষ দিয়ে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বাজারের থেকে বেশী দামে সৌর বিদ্যুৎ বিক্রি করার বরাত আদায় করেছে।এর ফলে ঐ গোষ্ঠী আগামী ২০ বছর ধরে অন্তত ২০০ কোটি ডলার বা ১৮০০০ কোটি টাকালাভ করতে পারবে। এর ফলে ইতিমধ্যেই দেশের জনগনকে অনেক বেশী দামে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো দামী হবে বিদ্যুৎ। চাষ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্রের উৎপাদন খরচ বাড়বে। গৃহস্থদের বাড়ীর বিদ্যুৎ খরচও বেড়ে যাবে। মানুষের জীবননির্বাহের খরচ এমনই বাড়বে যা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।

এখন প্রশ্ন হল এদেশে করা অপরাধের ব্যাপারে আমেরিকার মাথা গলাবার কি দরকার। আসি পরের ধাপে। এই প্রকল্পের জন্য আদানিরা মোট ২০০ ও ১০০ কোটি টাকা তুলেছিল যথাক্রমে বন্ড ও ঋণপত্রের মাধ্যমে। এর মধ্যে একটা অংশ আমেরিকা বাসীদের কাছ থেকে তোলা হয়েছিল আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জে আদানি গ্রীন এনার্জি নামে একটি সংস্থা নথিভুক্ত করে।সঙ্গে ছিল গ্লোবাল রিনিউয়েবল এনার্জি ও আগোরা পাওয়ার। আবার কানাডার সিডিপিকিউ নামে একটি সংস্থা যারা সেদেশে পেনশন ফান্ড দেখভাল করে।এরা ৫০ শতাংশ শেয়ার কেনে আদানি পাওয়ারের।

আমেরিকার সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেন্জ কমিশন বা এসইসি নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের আদালতে চার্জশিট দায়ের করেছে ফরেন কোরাপ্ট প্রাকটিস অ্যাক্ট অনুযায়ী। আমেরিকার অ্যাটর্নির দপ্তর ফৌজদারি অপরাধের চার্জশিট দিয়েছে গৌতম ও সাগর আদানি ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে। এরপর নিউইয়র্ক আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দায়ের করেছে আমেরিকা ও ভারতে এই দুইদেশের আইন তারা ভেঙেছেন বলে।

আমেরিকায় যেমন খুশী মামলা দায়ের করা যায় না। কোন অভিযোগ থাকলে তা তথ্য প্রমাণসহ পেশ করতে হবে। একজন জুরি সেসব খুঁটিয়ে দেখবেন। তারপর তিনি অনুমতি দিলে মামলা শুরু হবে। যাতে ভুয়া বা ফালতু মামলা করে আদালতের অমূল্য সময় নষ্ট না হয় তাই এই ব্যবস্থা। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এফবিআই তথ্য প্রমাণ পেশ করে বলেছে গৌতম আদানি নিজে বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে যে কথা বলেছে ঘুষের ব্যাপারে তার সবরকম প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে। সরকারিভাবে মামলা হয়েছে প্রকল্প সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য।

অভিযোগটি আটজনের বিরুদ্ধে। গৌতম ও সাগর আদানি, আগোরা পাওয়ারের প্রাক্তন সিইও রনজিত গুপ্ত যিনি ২০২২ সাল পর্যন্ত ছিলেন, চীফ স্ট্রেটেজিক ও কমার্শিয়াল অফিসার রূপেশ আগরওয়াল, এমডি ও সিইও বিনিত জৈন,কানাডার পেনসন বিভাগের কর্তা সিবিল কাবানিজ (এদের অর্থ আগোরা পাওয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছিল) প্রমুখের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ।

চার্জশিটের মূল বক্তব্য ঃ আদানি গ্রীণ এনার্জি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সোলার এনার্জি কর্পোরেশনের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ

বিক্রি করার চুক্তি করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যে যে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাগুলি আছে (যেমন এই রাজ্যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি) তাদের মাধ্যমে তা বন্টনের জন্য সোলার এনার্জি কর্পোরেশন উদ্যোগ নিলেও তা কোন রাজ্য সংস্থা চড়া দামে তা কিনতে রাজী হয় নি।ঠিক তখনই গৌতম আদানি ও তার সংস্থার পদাধিকারীরা মাঠে নামেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে তাদের বৈঠক হয় ও ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির ঘনিষ্ঠ সহযোগী জগন্মোহন রেড্ডিসহ আধিকারিকদের জন্য খরচ হয় সর্বোচ্চ ১৭৫০ কোটি টাকা। কিছুদিনের মধ্যেই আদানিরা অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, ছত্রিসগড়, ওড়িশা, তামিলনাড়ুতে সৌরবিদ্যুৎ এর বরাত পায়। এই ঘুষ দিয়ে বরাত পাওয়ার বিষয়টির ফলে আমেরিকার 'ফরেন কোরাপ্ট আইন' আদানিরা ভেঙেছেন আমেরিকা বলেছে। তাই আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবী ওঠে। হয় সেই দেশের সরকার তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করে শাস্তি দিক নাহলে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও,আমরাই ওর শাস্তির ব্যবস্থা করব।এই হচ্ছে আমেরিকার আইন। এখন এই ধরণের অপরাধের শাস্তি আমেরিকায় বিশ বছরের জেল।সুতরাং এদেশেই আদানি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে গ্রেপ্তার করে মামলা চালাতে হবে।শেষ পর্যন্ত মোদীকে এটাই করতে হবে তার সন্তানতুল্য গৌতম আদানিকে বাঁচাতে। এর ফলে বিজেপি তথা মোদী কোম্পানি ব্যাকফুটে চলে যেতে বাধ্য।

ইতিমধ্যেই ফ্রান্স,আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, শ্রীলংকা সরকার আদানিদের বিভিন্ন বরাত বাতিল করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এদেশের সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে নি। প্রশ্ন উঠেছে ইডি,সিবিআই কি শীতঘুমে? মোদী সরকার দেশের স্বার্থ রক্ষার বদলে একটা জালিয়াত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় এত তৎপর কেন এই প্রশ্নও উঠে গেছে। আদানিদের শেয়ারের ধ্বস নেমেছে।দেশীয় শেয়ার লগ্নীকারীদের ব্যাপক লোকসান হয়েছে ও আরও হবে। দেশের অন্যতম নামী আইনজীবী মুকুল রোহতগী ও মহেশ জেটমালানী আদানিদের ক্লিন চিট দিতে রাস্তায় নেমেছেন। আদানি গোষ্ঠীর মুখপাত্র না হয়েও কেন তারা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তা তারাই জানেন। সম্বিত পাত্রর মত মিথ্যভাষণে পটু শেয়ার বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগে বিরোধীদের বিঁধছেন।কেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনেকে বলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মোদীর ঘনিষ্ঠতা আদানিদের এই অবস্থা থেকে বার করে আনবে যা এত সহজে হবে বলে মনে হয় না।আমেরিকার মিডিয়া ও বিচারবিভাগ আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। মোদীর দুর্বল জায়গার সুবিধা নিয়ে ট্রাম্প দেনাপাওনার দরকষাকষি করে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারবে। যেমন দরুন ভারত থেকে যে সব পণ্য আমেরিকায় রপ্তানি হয় তাতে বেশী শুল্ক চাপিয়ে বাধা সৃষ্টি,ভিসা সংক্রান্ত। নীতিতে পরিবর্তন এনে ভারতের যেসব নাগরিক দীর্ঘদিন ওদেশে রয়েছে তাদের আমেরিকাছাড়া করা ও ঐসব চাকরির দরজা নিজেদের দেশের তরুণদের জন্য খুলে দেওয়ার মত বিভিন্ন ব্যবস্থা। এখন দেখার মোদী সরকার সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থ দেখবেন না আদানিদের স্বার্থে কাজ চালিয়ে যাবেন।

সংবিধান প্রণয়ন : বাবাসাহেব আম্বেদকর ও পন্ডিত জওহরলাল নেহরু

শুভাশিস মজুমদার

জন্মসূত্রে মধ্যপ্রদেশ ও পরিবারগত দিক থেকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতরত্ন ড. ভিমরাও রামজি আম্বেদকর, যিনি বাবাসাহেব আম্বেদকর নামেই অধিক পরিচিত, যুক্ত থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূত্রে এই বাংলার (অবিভক্ত) সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না বা বিস্মৃত হয়েছি।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, গণপরিষদ (ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গঠিত কমিটি) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সালে।তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি।মুসলিম লিগ সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদ বয়কট করে। মুসলিম লিগের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করায় বড় লাট লর্ড ওয়াভেল গণ পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন।প্রথম অধিবেশন থেকেই বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণ পরিষদের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হন। ১৩ ডিসেম্বর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরু সংবিধানের 'লক্ষ সম্পর্কিত' বক্তৃতাটি প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় ভারতকে 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়। এর নাগরিকদের 'আইন ও জন নৈতিকতার সাপেক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের; সমমর্যাদা লাভের; সমান সুযোগসুবিধার; আইনের সমবিচারের; চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের, ধ্যানধারণার ও ধর্মবিশ্বাসের, ইচ্ছামতন কাজ করার, মেলামেশা করার ও সক্রিয় হবার স্বাধীনতার নিশ্চিতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে সংখ্যালঘুদের, পিছিয়ে- পড়া অনুন্নত শ্রেণির মানুষদের জন্য যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হবে ।' এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সময় পন্ডিত নেহরু মহাত্মা গান্ধির অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি ফরাসি , মার্কিন ও রুশ বিপ্লবের কথাও স্মরণ করেন।

গণ পরিষদের বাংলার সদস্যদের যে নামের তালিকা ছিল তার প্রথম ও দ্বিতীয় নাম দুটি ছিল যথাক্রমে শ্রীশরৎ চন্দ্র বোস

(বিশিষ্ট আইনজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা) ও ড. বি. আর. আম্বেদকর। অবিভক্ত বাংলার যশোর ও খুলনা জেলার তপশিলি সংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর এই কমিটিতে নির্বাচিত হন। তাঁকে তপশিলি সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নেতা যোগেন মন্ডল সমর্থন করেন।মুসলিম লীগও তাঁকে সমর্থন করে। অবশ্য, ১৯৪৭ সালে যশোর ও খুলনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাবাসাহেব আম্বেদকর ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন বম্বে প্রভিন্স থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়ে এই ভারতীয় গণপরিষদে আসেন। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও গণ পরিষদের সভাপতি ড.রাজেন্দ্র প্রসাদ তৎকালীন অবিভক্ত বম্বে স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী বি.জি.খেরকে চিঠি লিখে ড.আম্বেদকরের নির্বাচন সেখান থেকে সুনিশ্চিত করতে বলেন। এম.আর.জয়াকর গণ পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে ড. আম্বেদকরকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ করে দেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়। নতুন তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরু ড. আম্বেদকরের নাম ভারত সরকারের আইনমন্ত্রী পদের জন্য প্রস্তাব করেন।শুধু তাই নয় সংবিধান প্রণয়নকারী গণ পরিষদের 'সংবিধান খসড়া কমিটি'র সভাপতি পদে ড. আম্বেদকরকে নিয়োগ করা হয়। এই গণপরিষদ এর তত্বাবধানে তৈরি হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও আমাদের গর্বের সংবিধান।

মহাত্মা গান্ধি একদা এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি হবেন একজন অস্পৃশ্যা নারী। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি। কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় পূরণ হয় যখন অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ড. বি. আর. আম্বেদকরকে গণ পরিষদের সংবিধান খসড়া সমিতির সভাপতি র পদ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো হল।

১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর অর্থাৎ গণ পরিষদের অন্তিম অধিবেশনের আগের দিন আম্বেদকর এক মর্মস্পর্শী ভাষণে সংবিধান খসড়া কমিটির কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন। তিনি ধন্যবাদ জানান খসড়া কমিটির সকল সদস্যকে, ধন্যবাদ জানান সাহায্যকারী কর্মীদের। এবং তিনি ধন্যবাদ জানালেন সেই পার্টিকে (পড়ুন কংগ্রেস), তিনি সারা জীবন ধরে যে পার্টির বিরোধিতা করে এসেছেন। তিনি বলেন 'পরিষদ কক্ষের ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেসের নেতারা শান্তভাবে কাজ না করে গেলে তাঁর পক্ষে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা বার করে আনা সম্ভব হত না। কংগ্রেস পার্টির এই শৃঙ্খলার সুবাদেই খসড়া কমিটির পক্ষে প্রত্যেকটি ধারা ও প্রত্যেকটি সংশোধনীর পরিণতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে খসড়া সংবিধানকে গণ পরিষদে ঠিক মতন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।' (গাঁধী উত্তর ভারত- রামচন্দ্র গুহ ,পৃষ্ঠা -১০৭- ১০৮)।

সংবিধান প্রণীত হবার পর ১৯৫০ সালে আইনমন্ত্রী ড. আম্বেদকর প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে সংসদে 'হিন্দু কোড বিল' পেশ করেন। যুগান্তকারী এই বিলে হিন্দু পুরুষদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়, সম্পত্তিতে কণ্যা সন্তানদের পুত্র সন্তানদের সঙ্গে সমান উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আদালতের সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ হয়, অন্যবর্ণের পুত্র বা কণ্যা সন্তান দত্তক নেওয়া আইনসিদ্ধ হয়। রক্ষণশীল হিন্দুরা এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করে। আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, রাম রাজ্য পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার শুরু করে।তাদের মতে এই বিল হিন্দু ধর্মের ওপর চূড়ান্ত অন্যায় হস্তক্ষেপ। পন্ডিত নেহরু দৃঢ়তার সঙ্গে ড. আম্বেদকরকে সমর্থন করেন। এই সময় রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ পন্ডিত নেহরুকে এই বিল প্রণয়নে তাঁর আপত্তির কথা জানান। পন্ডিত নেহরু বলেন দেশের জনতার সিংহভাগ হিন্দু ও তাঁর শতকরা ৫০ ভাগ নারী। এই বিল প্রণয়নে দেশের মানুষের সমর্থন তাঁর দিকে আছে বলে তিনি মনে করেন।এই সময় রক্ষণশীল হিন্দুরা সকল ধর্মের মানুষের জন্য একই দেওয়ানি আইন বিধি প্রবর্তনের কথা বলেন। এর উত্তরে নেহরুজি বলেন একই দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের জন্যই আমরা সংবিধানে ৪৪ নং ধারা সংযোজন করেছি। হিন্দু কোড বিল ওই কাজের দিকেই অগ্রসর হওয়া। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠলে এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করা হবে। ড. আম্বেদকর বলেন 'হিন্দু কোড বিল' রচনা করতেই এতগুলি বছর লাগলো, এখন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রচনা করতে আরো ১০ বছর লেগে যাবে। এই সময় রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে বলেন বর্তমান সংসদ প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত নয়। কাজেই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫১-৫২ তে নতুন সংসদ নির্বাচিত হয়ে আসলে সেই সংসদ এই হিন্দু কোড বিল গ্রহণ করলে তা সমীচীন হবে। রাষ্ট্রপতির এই বক্রব্য সমীচীন বলে পন্ডিত নেহেরু মনে করেন।

এর ফলে ড.আম্বেদকর পন্ডিত নেহরুর ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন পন্ডিত নেহরু আপোষ করছেন।১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাবাসাহেব নেহেরু মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি নতুন দল গঠন করে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার হিন্দু কোড বিলকে সামনে রেখে তীব্র পন্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস বিরোধী প্রচার চালায় । তারা স্লোগান তোলে 'পাকিস্তান তোড় দো, নেহরু হুকুমত ছোড় দো'। কিন্তু নেহরু ও কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়যুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ড. আম্বেদকর, বম্বে উত্তর আসনে ১৯৫২ সালের ওই সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী নারায়ণ কাজরলকরের কাছে পরাজিত হলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে তিনি রাজ্যসভার সদস্য (৩ এপ্রিল,১৯৫২ - ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬) হন এবং আমৃত্যু সদস্য থাকেন। পন্ডিত নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালেই তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন ও বিচারমন্ত্রী (১৫ আগস্ট,১৯৪৭-১১ অক্টোবর১৯৫১) হয়েছিলেন।

ড. আম্বেদকর ১৯৫৪ সালে উপ-নির্বাচনে ভাণ্ডারা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে লোকসভার সদস্য হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই নির্বাচনে তিনি তৃতীয় স্থান পান এবং জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী। ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের আগেই তিনি প্রয়াত হন (৬ ডিসেম্বর,১৯৫৬)।

ড.বি.আর.আম্বেদকর কখনোই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। তাঁর দল ছিল 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি'। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কংগ্রেসের এবং গান্ধিজীর কঠোর সমালোচক ছিলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের পূজারী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বিরোধী মতামতকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, তেমনই বিশেষ ব্যক্তিদের গুণের মর্যাদা দিতেন। চাইতেন দেশ গঠনের কাজে তাঁদেরও অবদান থাকুক। ড.আম্বেদকরকে গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া রচনার শীর্ষপদে রেখে, তাঁকে স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন ও বিচারমন্ত্রী করে এবং ১৯৫২ সালে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরেও সাদরে ড.আম্বেদকরকে রাজ্যসভার সদস্য করে নিয়ে এসে পন্ডিত নেহরু এর প্রমাণ দিয়েছেন।

ড.বি.আর.আম্বেদকরের অবদানকে সম্মান জানিয়েও উল্লেখ করা যায়, ভারতের সংবিধানের কাঠামো ও মতবাদ পন্ডিত নেহরুর দার্শনিক চিন্তা ও জ্ঞানের প্রতিফলন। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজবাদী দর্শনই ছিল পন্ডিত নেহরুর মতাদর্শ, যা তিনি আমৃত্যু দৃঢ়তার সঙ্গে আগলে রেখেছিলেন। পন্ডিত নেহরু ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। ঐ বছরে ৯ ডিসেম্বর পন্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভায় ড.আম্বেদকর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ১৫ আগস্ট,১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে গান্ধিজীর সঙ্গে সহমত হয়ে পন্ডিত নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন ও বিচারমন্ত্রী হিসেবে ড.আম্বেদকরকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসেন। একই ভাবে গান্ধিজী এবং পন্ডিত নেহরু সহমত হয়ে ২৯ আগস্ট, ১৯৪৭-এ গণপরিষদের সংবিধান খসড়া রচনা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় ড.আম্বেদকরকে, যে গণপরিষদের কাজ জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এবং দার্শনিক ভাবধারায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ের কমিটির মতামত ও পরামর্শ গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা পরে প্রয়োজন মতো পরিমার্জন করে লিপিবদ্ধ করা হতো। ইতিমধ্যেই আমরা জানি, ভারতের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' বা 'প্রীঅ্যামবেল', যা সংবিধানের 'মূল দর্শন বা নীতি', তা ১৩ ডিসেম্বর,১৯৪৬- এ পন্ডিত নেহরু অবতারণা করেন। এই কথা ড.আম্বেদকরের খসড়া রচনা কমিটি স্বীকৃত। সংবিধানের এই প্রস্তাবনা সংবিধানের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট রূপরেখা দেয়।

১৯৭৩ সালে এক যুগান্তকারী রায়ে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস এস সিকরি বলেন, 'আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা-র গুরুত্ব অপরিসীম এবং প্রস্তাবনায় ব্যক্ত দর্শন অনুসরণ করে সংবিধানের পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যা করা উচিত।'

এই কথা উল্লেখযোগ্য, সংবিধানের গঠন ও দর্শন যা আমাদের সংবিধানকে স্থায়িত্ব দেয় ও পথ নির্দেশ করে তাহা পন্ডিত নেহরু প্রবর্তিত দর্শন থেকেই পাওয়া যা তিনি ড.আম্বেদকর খসড়া রচনা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার অনেক আগেই গণপরিষদের সভায় ব্যক্ত করেছিলেন। সংবিধানে বর্ণিত মূল নীতিগুলি ও সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলির সর্বত্র পন্ডিত নেহরুর মস্তিষ্কপ্রসুত চিন্তা ও বিজ্ঞতার প্রকাশ স্পষ্ট যা তিনি গণপরিষদের ঐ সভায় আবেগঘন বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন। দেশের নাগরিকরাই সর্বশক্তিমান এবং তাদের অধিকার ও সমতা যাতে সুরক্ষিত থাকে এই ব্যাপারে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন, যা আমাদের সংবিধানেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গণপরিষদের সভার লিপিবদ্ধ বিবরণ পড়লেও জানা যায়, এর বিতর্কের তারকা বক্তা ছিলেন পন্ডিত নেহরু, অন্য কেউ নন। তাই সংবিধান প্রণয়নে ড.আম্বেদকরের অবদানের প্রতি পূর্ণ সম্মান জানিয়েও বলা যায়, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সুমহান, ভারতের সংবিধান প্রণয়নের একমাত্র না হলেও অন্যতম মূল কারিগর পন্ডিত জওহরলাল নেহরু।

হিন্দু কোড বিল যা হিন্দু আইনে বিবাহ ও সম্পত্তি বিষয়ে আমূল পরিবর্তন এনেছিল তা ড. আম্বেদকর রচনা করেছিলেন, প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে ঐ বিল পাশ না করানোর জন্য ড.আম্বেদকর ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পন্ডিত নেহরু কথা রেখেছিলেন। তিনি ওই বিশাল বিল পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাগে বন্টন করে সংসদে পাশ করান। ১৯৫৬ সালে ড.আম্বেদকর পরলোক গমন করেন। সংসদে তাঁর একদা সহকর্মী প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বলেন, ড. আম্বেদকর সবচেয়ে বেশি করে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন 'হিন্দু সমাজের যাবতীয় নিপীড়নমূলক বৈশিষ্টগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে।' শুধু তাই নয়, ' হিন্দু আইন সংস্কারের প্রশ্নে তিনি যে বিপুল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন সেই কারণেও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ভাবতে ভালো লাগছে যে সেই সংস্কারের সার্থক প্রবর্তনের অধিকাংশটাই তিনি দেখে যেতে পারলেন - যদিও তাঁর নিজ হস্তে রচিত সেই বিশালকায় রচনাটি হুবহু একই আকারে পাশ হয়নি , হয়েছে টুকরো টুকরো করে।' (রামচন্দ্র গুহ রচিত ' গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ', পৃষ্ঠা - ২১৫ - ২১৬)।

আজ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি এবং তাদের 'বি টিম' দলগুলি দেশের মানুষের ইতিহাস জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পন্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে যখন কুৎসা রটনায় ব্যস্ত তখন দেশের মানুষের কাছে প্রকৃত সত্যটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দু'টি বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

১৯৭৬ সালে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ দু'টি অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ভারত রাষ্ট্রের পরিচয় হিসাবে আগে থেকেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ছিল সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক, এই তিনটি শব্দ। ১৯৭৬ সালে তার সঙ্গে যুক্ত হয়, সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, এই দু'টি নতুন শব্দ।

এই দুই শব্দের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাগুলি একত্র করে ২৫ নভেম্বর, সোমবার, শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। মামলাকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী, সমাজকর্মী বলরাম সিংহ এবং আইনজীবী তথা দিল্লির বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়। মামলাকারীদের যুক্তি ছিল, ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আসল সংবিধানকে বিকৃত করছে। সংবিধান সভার আলোচনায় সংবিধানের প্রণেতারা এই দু'টি শব্দকে প্রস্তাবনার বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন বলেও দাবি করেন তাঁরা। আবেদনকারীরা ১৯৭৬ সালের সংসদের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন, যা জরুরি অবস্থার সময় এবং একটি বর্ধিত মেয়াদের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল।

কিন্তু এই দিন (২৫ নভেম্বর) আবেদনকারীদের সব যুক্তি খারিজ করে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দ দু'টি বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, অনুচ্ছেদ ৩৬৮ অনুসারে সংবিধান সংশোধন করতে পারে সংসদ। তবে সেই সংশোধনী অবশ্যই সংবিধানের মূল কাঠামো বা 'বেসিক স্ট্রাকচার'-এর অনুসারী হতে হবে।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে সংবিধান সংশোধনীর বিষয়ে সংসদকে ক্ষমতা দিয়েছে সংবিধানই। তা ছাড়া এই দু'টি শব্দ এত বছর ধরে বহু বিচার বিভাগীয় পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে গিয়েছে বলেও পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। ১৯৯৪ সালের এসআর বোম্মাই মামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই দু'টি শব্দ সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী নয়।

যুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে, বেঞ্চ জোর দেয় যে সংবিধান সংশোধনের ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদের কর্তৃত্ব প্রস্তাবনা পর্যন্ত প্রসারিত। আদালত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে সংশোধনীটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে কয়েক দশক ধরে ব্যাপক বিচার বিভাগীয় যাচাই-বাছাই এবং আইনী অনুমোদনের মধ্য দিয়ে গেছে।

পূর্ববর্তী শুনানির সময়, আদালত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষ্মসমাজতন্ত্রক্ষ্ম এর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলে, এটি নিশ্চিত করে যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই শব্দটি একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে নির্দেশ করে এবং বেসরকারি খাতের বৃদ্ধির বিরোধিতা করে না। তভারতে সমাজতন্ত্র (অর্থ) হল (নাগরিকদের মধ্যে) সম্পদের সুষম বণ্টন এবং সুযোগের সমতা রক্ষা করা। এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বাধা দেয় না, যা আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করে,দ শীর্ষ আদালত মন্তব্য করেছিল।

সলিল চৌধুরী : সংগীতের জগতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

শতবর্ষে পদার্পণ করলেন সলিল চৌধুরী। সামনের বছর তাঁর শতবর্ষ পূরণ হবে (১৯.১১.১৯২৫- ০৫.০৯.১৯৯৫)। জন্ম অসমে। কিন্তু পৈতৃক নিবাস ছিল গাজিপুর-চব্বিশ পরগনায়। সংগীতানুরাগী চিকিৎসক পিতা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরীর কর্মস্থল ছিল আসাম। খ্যাতনামা সুরকার, গীতিকার এই শিল্পীর সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয় তাঁর পিতার কাছে। পরিবারে গান-বাজনার চর্চা ছিল-বিশেষ করে পাশ্চাত্য সংগীতের। জ্যাঠতুতো দাদা নিখিল চৌধুরীর 'মিলন পরিষদ অর্কেস্ট্রা' ক্লাবে বেহালা, পিয়ানো ও এস্রাজ শিক্ষায় তাঁর হাতেখড়ি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়ায় মামাবাড়িতে থাকার সময় গ্রামীণ পরিবেশে বাঁশি, দোতারা ও একতারা বাদনে আগ্রহী হয়ে পড়েন। সংগীত চর্চা চলতে থাকে। এরই মধ্যে তিনি নাড়া বেঁধেছিলেন প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের তবলিয়া বিশ্বনাথ কুণ্ডুর কাছে।

পড়াশোনা করেছেন হরিনাভি হাইস্কুল ও বঙ্গবাসী কলেজে। সোনারপুরের কৃষক আন্দোলন ও কলেজ জীবনে ছাত্র আন্দোলনের প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নিত্যানন্দ চৌধুরীর প্রভাবে কৃষকদের ও গণ আন্দোলনের সমর্থনে গান লেখা, সুর দেওয়া ও মিটিংয়ে গাওয়া শুরু করেন। প্রতি মিটিঙের জন্য তিনি সুর দিয়ে গাইতেন। তার আগেই অবশ্য। তিনি নাম করেছিলেন বাঁশি-বাজিয়ে হিসেবে। ১৯৪৪ খ্রিঃ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন। ছাত্র জীবনে ১৯৪৫ খ্রি. আন্দামান থেকে ফেরত আসা বন্দি এবং আই. এন. এ. বন্দিদের বিচারের তোড়জোড় চলাকালে তিনি গান লিখে সুর দিলেন 'বিচারপতি তোমার বিচার/করবে যারা/আজ জেগেছে সেই জনতা।

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতি ঝোঁক থেকেই তাঁর অসংখ্য গান লেখা ও সুর দেওয়া। ১৯৪৬ খ্রি. নৌবিদ্রোহের সমর্থনে লেখেন 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে'। লেখেন ও সুর করেন, 'যখন প্রশ্ন ওঠে ধ্বংস কি সৃষ্টি', 'ও আলোর পথযাত্রী', 'আমার প্রতিবাদের ভাষা', 'হেই সামালো ধান হো' ইত্যাদি গান। বাংলা গানের জগতে তাঁর লেখা ও সুর-দেওয়া গান 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ', 'পথে এবার নামো সাথী', 'না যেও না রজনী এখনো বাকি', 'ঝনন ঝনন বাজে', 'এ দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি',

'পথ হারাবো বলেই এবার, 'সে যে গান শুনিয়েছিল হয়নি শোনা', 'হলুদ গাঁদার ফুল', 'যা যা রে যা পাখি' প্রভৃতি এক স্বতন্ত্র ধারা বয়ে এনেছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা 'রানার' বা 'অবাক পৃথিবী'র মতো কবিতায় তাঁর দেওয়া সুর স্মরণীয়। পল্লিগ্রামের রাঙামাটির সুর তুলে এনেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'পাল্কীর গান'-এ। একেবারে দেশি সুর থেকে মার্গীয় সুর, পাশ্চাত্যের লৌকিক বা ক্ল্যাসিকাল সংগীতের চলন নিয়ে তিনি তাঁর দীর্ঘ সংগীতজীবনে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, গান বেঁধেছেন অনেক ভাষায়।

তাঁর সুরারোপিত গান গেয়ে ভারতের যেসব শিল্পী অমর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ রফি, মুকেশ, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় অন্যতম। সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মুঙ্গেশকরে গাওয়া 'নিশিদিন, নিশিদিন', 'না মন লাগে না', 'সাত ভাই চম্পা' ও 'না যেও না'; সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা' (কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের লেখা), আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ', ও 'গাগা রে পাখি গা' প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন 'ধীতাং ধিতাং বলে', 'ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা', 'পথ হারাবো বলেই এবার ,'এই লেগেছে পাক' ইত্যাদি যা বাংলা গানের রাজ্যে সেরা গান হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলা গানের মতোই হিন্দি গানেও তাঁর বিচরণ ছিল সাবলীল। তাঁর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা আসে চলচ্চিত্রের সুরকার হিসেবে। কলকাতায় ১৯৪৮ খ্রি. সত্যেন বসুর ছবি 'পরিবর্তন'- এ তিনি প্রথম সুর করেন। চলচ্চিত্র পরিচালক বিমল রায়ের আহ্বানে ১৯৫৩ খ্রি. তিনি বম্বে গিয়ে 'দো বিঘা জমিন' ছবিতে সুরসংযোজন করে ভারতে প্রথম শ্রেণির সংগীত পরিচালক হিসেবে খ্যাত হন। এই ছবি তাঁরই লেখা গল্প 'রিক্সাওয়ালা' অবলম্বনে তৈরি হয়। এই ছবির সুবাদে সেরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে তিনি লন্ডনের এশিয়াটিক ফিল্ম সোসাইটির পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর সুরারোপিত ছবির তালিকায় এ ছাড়া আছে 'মধুমতী', 'জাগতে রহো', 'বরাত', 'পরখ', 'নোকরি', 'পাশের বাড়ি', 'সিস্টার', 'লালপাথর', 'কবিতা', 'শ্রীকান্তের উইল', 'সারা আকাশ', 'আনন্দ', 'জীবন যেরকম'-সহ অসংখ্য হিন্দি, বাংলা ও অন্য ভাষাভাষী চলচ্চিত্র। সংগীতরচনা ও সুরসংযোজন ছাড়াও তাঁর লেখা কবিতা 'শপথ', ছোটো গল্প 'ড্রেসিং টেবিল' এবং নাটক 'জনান্তিক', 'অরুণোদয়ের পথে', 'সংকেত' উল্লেখযোগ্য।

জীবিতাবস্থায় সলিল চৌধুরী একজন অনন্যসাধারণ সংগীত পরিচালক ,সুরকার, গীতিকার ও গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মাত্র ৭০ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

সার্ধশত বর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি : বিরসা মুন্ডা (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫ - ৯ জুন ১৯০০)

বিরসা মুন্ডার নাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় উপজাতি স্বাধীনতা কর্মী এবং লোক নায়ক , যিনি মুন্ডা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একটি উপজাতি ধর্মীয় সহস্রাব্দ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের উত্থান হয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ রাজত্বের সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড), যার জন্য তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। এই বিদ্রোহ প্রধানত খুঁটি, তামর, সারওয়াদা এবং বান্দগাঁওয়ের মুন্ডা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বিরসা মুন্ডা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলায়) রাঁচি জেলার উলিহাতুতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২৪ বছর বয়সে ৯ জুন ১৯০০ রাঁচি জেলে। তাঁর বাবা সুগানা মুন্ডা, মা করমি হাতু। বিরসা তাঁর শিক্ষক জয়পাল নাগের তত্ত্বাবধানে সালগায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরে বিরসা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে জার্মান মিশন স্কুলে ভর্তি হন। স্কুল ছাড়ার পর বিরসা মুন্ডা বিরসাইত নামে একটি ধর্ম তৈরি করেন। মুন্ডা সম্প্রদায়ের সদস্যরা শীঘ্রই এই বিশ্বাসে যোগ দিতে শুরু করে যা ফলস্বরূপ ব্রিটিশদের ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। বীরসাইতরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে আসল শত্রু ব্রিটিশরা, খ্রিস্টান মুন্ডা নয়। মুন্ডা বিদ্রোহের কারণ ছিল 'ঔপনিবেশিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় ভূমি দখলের অনুশীলন যা উপজাতীয় প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল।' বিরসা মুন্ডা ব্রিটিশ খ্রিস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য এবং মুন্ডা ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মানুষদের ধর্মান্তরকরণ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য পরিচিত। ভারতীয় সংসদ জাদুঘরে তার প্রতিকৃতি টাঙানো আছে।

প্রারম্ভিক জীবন (১৮৭৫-১৮৮৬)

বিরসা মুন্ডা ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির রাঁচি জেলার উলিহাতু গ্রামে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলার অন্তর্গত) এক বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (কিছু সূত্র দাবি করে যে তিনি ১৮৭৫ সালে নয়, ১৮৭২ সালের ১৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন)। তাই তৎকালীন প্রচলিত মুন্ডা রীতি অনুসারে সেই দিনের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছিল। লোকগানগুলি জনপ্রিয় বিশ্বাস প্রতিফলিত করে এবং উলিহাতু বা চালকড়কে তাঁর জন্মস্থান হিসাবে উল্লেখ করে। উলিহাতু ছিল বিরসার পিতা সুগানা মুন্ডার জন্মস্থান। উলিহাতুর দাবির দায় বিরসার বড় ভাই কোমতা মুন্ডার উপর, যিনি গ্রামে থাকেন, যেখানে তাঁর বাড়ি জরাজীর্ণ অবস্থায় এখনও রয়েছে।বিরসা মুন্ডা (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫ - ৯ জুন ১৯০০) ছিলেন একজন ভারতীয়

উপজাতি স্বাধীনতা কর্মী এবং লোক নায়ক যিনি মুন্ডা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একটি উপজাতীয় ধর্মীয় যুগান্তকারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ রাজের সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) উত্থিত হয়েছিল, যার ফলে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। এই বিদ্রোহ প্রধানত খুন্তি, তামর, সারওয়াদা এবং বান্দগাঁওয়ের মুন্ডা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

বিরসা মুন্ডা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের খুন্তি জেলায়) রাঁচি জেলার উলিহাতুতে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর মৃত্যু ৯ জুন ১৯০০ (বয়স ২৪) রাঁচি জেলে। বিরসা তাঁর শিক্ষক জয়পাল নাগের তত্ত্বাবধানে সালগায় শিক্ষা লাভ শুরু করেছিলেন। পরে বিরসা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে জার্মান মিশন স্কুলে ভর্তি হন। স্কুল ছাড়ার পর বিরসা মুন্ডা বিরসাইত নামে একটি ধর্ম তৈরি করেন। মুন্ডা সম্প্রদায়ের সদস্যরা শীঘ্রই এই বিশ্বাসে যোগ দিতে শুরু করে যা ফলস্বরূপ ব্রিটিশদের ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। বীরসাইতরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে আসল শত্রু ব্রিটিশরা, খ্রিস্টান মুন্ডা নয়। মুন্ডা বিদ্রোহের কারণ ছিল 'ঔপনিবেশিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় ভূমি দখলের অনুশীলন যা উপজাতীয় প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল'। বিরসা মুন্ডা ব্রিটিশ খ্রিস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য এবং মুন্ডা ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মান্তরকরণ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য পরিচিত। ভারতীয় সংসদ জাদুঘরে তার প্রতিকৃতি টাঙানো আছে।

বিরসা মুন্ডা ১৮৭৫ সালের ১৫ নভেম্বর এক বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (কিছু সূত্র দাবি করে যে তিনি ১৮৭৫ সালে নয়, ১৮৭২ সালের ১৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাই তৎকালীন প্রচলিত মুন্ডা রীতি অনুসারে সেই দিনের নামানুসারে (বিরসা) নামকরণ করা হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে রচিত লোকগানগুলি জনপ্রিয় বিশ্বাস প্রতিফলিত করে এবং উলিহাতু বা চালকড়কে তাঁর জন্মস্থান হিসাবে উল্লেখ করে। উলিহাতু ছিল বিরসার পিতা সুগানা মুন্ডার জন্মস্থান। উলিহাতুর দাবির দায় বিরসার বড় ভাই কোমতা মুন্ডার উপর, যিনি গ্রামে থাকেন, যেখানে তাঁর বাড়ি জরাজীর্ণ অবস্থায় এখনও রয়েছে। বিরসার বাবা, মা করমি হাতু এবং ছোট ভাই পাসনা মুন্ডা, উলিহাতু ছেড়ে শ্রমিক (সজেদারি) বা ফসলের ভাগীদার (রায়ত) হিসাবে কাজের সন্ধানে বীরবাঁকির কাছে কুরুম্বদায় চলে যান। কুরুম্বদায়, বিরসার বড় ভাই কোমতা এবং তাঁর বোন ডাসকিরের জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে পরিবারটি বাম্বায় চলে যায় , যেখানে বিরসার বড় বোন চম্পার জন্ম হয়েছিল। বিরসার শৈশবকাল চলকাডে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে কেটেছে। তাঁর প্রথম জীবন একজন সাধারণ মুন্ডা শিশুর থেকে খুব বেশি আলাদা হতে পারে না। লোককাহিনী বলতে তার বন্ধুদের সাথে বালি এবং ধুলায় গড়াগড়ি খাওয়া এবং খেলা করা এবং চেহারায় তার শক্তিশালী এবং সুদর্শন বেড়ে ওঠাকে বোঝায়। তিনি বোহোন্ডার জঙ্গলে ভেড়া চরাতেন। বড় হয়ে তিনি বাঁশি বাজানোর আগ্রহ ভাগ করে নিয়েছিলেন, এতে তিনি বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। কুমড়ো থেকে তৈরি একতারের যন্ত্র তুইলা হাতে আর কোমরে ঝোলানো বাঁশি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। তাঁর শৈশবের রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলি আখড়ায় (গ্রামের কুস্তির মাঠ) অতিবাহিত হয়েছিল। যাইহোক, তাঁর একজন আদর্শ সমসাময়িক এবং যিনি তাঁর সাথে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি তাকে অদ্ভুত জিনিসের কথা বলতে শুনেছিলেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিরসাকে তার মামার গ্রাম আয়ুভাতুতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর বড় ভাই কোমতা মুন্ডা, যার বয়স দশ বছর, কুন্ডি বার্তোলিতে গিয়েছিলেন, একজন মুন্ডার চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন, বিয়ে করেছিলেন এবং সেখানে আট বছর বসবাস করেছিলেন এবং তারপরে তাঁর বাবা এবং ছোট ভাইয়ের সাথে চালকাদে যোগ দিয়েছিলেন। বিরসা আয়ুভাতুতে দুই বছর ছিলেন। জয়পাল নাগ নামে এক ব্যক্তির পরিচালনায় শালগায় স্কুলে পড়তেন তিনি। তিনি তার মায়ের ছোট বোন জনির সাথে গিয়েছিলেন, যিনি তাকে পছন্দ করেছিলেন, যখন তিনি বিবাহিত ছিলেন, তার নতুন বাড়ি খাটাঙ্গায় গিয়েছিলেন। তিনি একজন খ্রিস্টান মিশনারির সংস্পর্শে এসেছিলেন যিনি গ্রামের কয়েকটি পরিবার পরিদর্শন করেছিলেন যা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। বিরসা মুন্ডা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে খ্রিস্টান মিশনারিরা আদিবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করছে। বিরসা শীঘ্রই খ্রিস্টান মিশনারিদের চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে এবং মুন্ডা ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মান্তরকরণ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিরসা পড়াশোনায় তীক্ষ্ণ হওয়ায় জয়পাল নাগ তাকে জার্মান মিশন স্কুলে যোগদানের সুপারিশ করেন এবং বিরসা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং তার নামকরণ করা হয় বিরসা ডেভিড, যা পরে বিরসা দাউদ হয়ে যায়। কয়েক বছর পড়াশোনা করার পর তিনি জার্মান মিশন স্কুল ছেড়ে দেন।

গঠনমূলক পর্যায়

১৮৮৬ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত চাইবাসায় বিরসার অবস্থান তাঁর জীবনের একটি গঠনমূলক সময় গঠন করেছিল। এই সময়টি জার্মান এবং রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান আন্দোলন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে সুগনা মুন্ডা তার ছেলেকে স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে চাইবাসা ত্যাগ করার পরপরই বিরসা ও তাঁর পরিবার জার্মান মিশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, খ্রিস্টান হওয়া বন্ধ করে দেন এবং তাঁর মূল ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় ধর্মীয় ব্যবস্থায় ফিরে যান। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি জারবেরা ত্যাগ করেন। পোরহাট এলাকায় পিরিং-এর গিদিওনের নেতৃত্বে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মুন্ডাদের ঐতিহ্যবাহী অধিকারের উপর আরোপিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষ থেকে উদ্ভূত এই আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ১৮৯৩-৯৪ সালে ১৮৮২ সালের

ভারতীয় বন আইন সপ্তম এর অধীনে গ্রামের সমস্ত পতিত জমি, যার মালিকানা সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল, সুরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। লোহারদাগার মতো পশ্চিম সিংভূমেও বন বসতি স্থাপন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল এবং বনবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার নির্ধারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বনাঞ্চলের গ্রামগুলিকে সুবিধাজনক আকারের ব্লকগুলিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল যার মধ্যে গ্রামীণ সাইট এবং গ্রামের প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত চাষযোগ্য পতিত জমি ছিল। ১৮৯৪ সালে, বিরসা একজন শক্তিশালী যুবক, চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসাবে বেড়ে ওঠেন এবং বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ জারবেরায় ডোম্বারি ট্যাঙ্ক মেরামতের কাজ হাতে নেন। পশ্চিম সিংভূম জেলার শঙ্কর গ্রামের আশেপাশে থাকার সময়, তিনি একজন উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পেয়েছিলেন, তার পিতামাতাকে গহনা উপহার দিয়েছিলেন এবং তার বিয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরে জেল থেকে ফিরে এসে তিনি তাকে তার প্রতি বিশ্বস্ত দেখতে না পেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যান। চালকাদে তাঁর সেবা করা আরেক মহিলা ছিলেন ম্যাথিয়াস মুন্ডার বোন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে, কোয়েনসারের মথুরা মুন্ডার কন্যা যাকে কালী মুন্ডা রেখেছিলেন এবং জিউরির জগা মুন্ডার স্ত্রী বিরসার স্ত্রী হওয়ার জন্য জোর দিয়েছিলেন। তিনি তাদের ধমক দেন এবং জগা মুন্ডার স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে রেফার করেন। বিরসার সাথে থাকা আরেকজন সুপরিচিত মহিলা ছিলেন বুরুন্ডির সালি। বিরসা তার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে একগামিতার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিরসা কৃষকদের সর্বনিম্ন স্তর থেকে উত্থিত হয়েছিল, রায়ত, যারা অন্য কোথাও তাদের নামধারীদের বিপরীতে মুন্ডারি খুন্তকাট্টি ব্যবস্থায় অনেক কম অধিকার ভোগ করেছিল; যদিও প্রতিষ্ঠাতা বংশের সদস্যদের দ্বারা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একচেটিয়া ছিল, রায়তরা ফসলের অংশীদারদের চেয়ে ভাল ছিল না। কর্মসংস্থানের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গাড়ি চালিয়ে যাওয়া তরুণ বয়সে বিরসার অভিজ্ঞতা তাকে কৃষি প্রশ্ন এবং বন সম্পর্কিত বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল; তিনি কোনও নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলেন না তবে পাড়ায় পাড়ায় চলা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

আদিবাসী ধর্মের পুনরুজ্জীবন

বিরসাকে ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ খ্রিস্টান মিশনারি কাজের দ্বারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর সম্প্রদায়ের অধীনে অনেক আদিবাসী ইতিমধ্যে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তিনি চার্চ এবং এর অনুশীলন যেমন কর আরোপ এবং ধর্মীয় রূপান্তরগুলির বিরোধিতা ও সমালোচনা করেছিলেন। ১৮৯৫ সালে, বিরসা সর্বোচ্চ ঈশ্বরের দর্শন দেখেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি নিজে একজন প্রচারক এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী উপজাতীয় ধর্মের প্রতিনিধি হয়েছিলেন এবং শীঘ্রই তিনি একজন নিরাময়কারী, একজন অলৌকিক কর্মী এবং প্রচারক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মুন্ডা, ওরাওঁ এবং খারিয়ারা তাঁকে দেখতে এবং তাদের অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের জন্য চালকড়ে ভিড় করেছিল। বারোয়ারি ও চেচারী পর্যন্ত ওরাওঁ ও মুন্ডা জনগোষ্ঠী উভয়ই বিরসাইতে পরিণত হয়। সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের লোকগানগুলি তাঁর জনগণের উপর বিরসার অসাধারণ প্রভাব, তাঁর আবির্ভাবের সময় তাদের আনন্দ এবং প্রত্যাশার কথা স্মরণ করে। সবার মুখে মুখে ছিল ধরতি আবার নাম। বিরসা মুন্ডা আদিবাসীদের তাদের মূল ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী ধর্মীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করার পরামর্শ দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে তিনি উপজাতিদের কাছে একজন সাধু ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন এবং তারা তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

আদিবাসী আন্দোলন ব্রিটিশ রাজকে হুমকি দিয়ে বিরসা মুন্ডার স্লোগান , ক্ষ্মআবু রাজ এতে জানা, মহারাণী রাজ তুন্ডু জানাক্ষ্ম (ক্ষ্মরানীর রাজত্ব শেষ হোক এবং আমাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোকক্ষ্ম), আজও ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশে স্মরণ করা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা উপজাতীয় কৃষি ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরকে তীব্রতর করে। আদিবাসীরা তাদের আদিম প্রযুক্তি দিয়ে উদ্বৃত্ত তৈরি করতে না পারায় ছোটনাগপুরের প্রধানরা অ-আদিবাসী কৃষকদের জমিতে বসতি স্থাপন ও চাষাবাদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এর ফলে আদিবাসীদের দখলে থাকা জমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঠিকাদারদের নতুন শ্রেণী আরও ধর্ষক ধরণের ছিল এবং তাদের সম্পত্তির সর্বাধিক উপার্জন করতে আগ্রহী ছিল।১৮৫৬ সালে জায়গিরগুলি প্রায় ৬০০ এ দাঁড়িয়েছিল এবং তারা একটি গ্রাম থেকে ১৫০৮ টি গ্রামে ছিল। কিন্তু ১৮৭৪ সালের মধ্যে পুরাতন মুন্ডা বা ওরাওঁ প্রধানদের কর্তৃত্ব জমিদারদের দ্বারা প্রবর্তিত কৃষকদের দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। কিছু গ্রামে, তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের মালিকানা অধিকার হারিয়েছিল এবং কৃষি শ্রমিকের অবস্থানে নেমে এস কৃষি ভাঙন এবং সংস্কৃতি পরিবর্তনের দ্বৈত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায়, বিরসা মুন্ডার সাথে তাঁর নেতৃত্বে একাধিক বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ১৮৯৫ সালে, তামারের চালকাড় গ্রামে, বিরসা মুন্ডা খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করেন এবং তার সহকর্মী উপজাতিদের কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা করতে এবং বঙ্গের উপাসনা ছেড়ে দিতে বলেন। তিনি নিজেকে একজন নবী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন যিনি তাঁর লোকদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং মুন্ডা রাজ শুরু হয়েছে। তিনি রায়তদের (প্রজাচাষীদের) খাজনা না দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুণ্ডারা তাঁকে ধরতি বাবা অর্থাৎ পৃথিবীর পিতা বলে ডাকত।

একটি গুজব রটেছিল। তা হচ্ছে এই যে, যারা বিরসাকে অনুসরণ করেনি তাদের গণহত্যা করা হবে। বিরসাকে ২৪ আগস্ট ১৮৯৫ সালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দুই বছরের কারাদণ্ডে

দণ্ডিত করা হয়। ২৮ জানুয়ারী ১৮৯৮ সালে, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে চুতিয়ায় যান রেকর্ড সংগ্রহ করতে এবং মন্দিরের সাথে জাতিগত সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বলেছিলেন যে মন্দিরটি কোলদের অন্তর্গত। খ্রিস্টান মিশনারিরা বিরসা এবং তাঁর অনুসারীদের গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল, যারা তাঁদের ধর্মান্তরিত করার ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। বিরসা দুই বছরের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়েছিলেন কিন্তু একাধিক গোপন বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

কথিত আছে যে ১৮৯৯ সালের ক্রিসমাসের আশেপাশে প্রায় ৭০০০ পুরুষ ও মহিলা একত্রিত হয়েছিল, উলগুলান (গ্রেট টামাল্ট) ঘোষণা করতে যা শীঘ্রই খুঁটি, তামার, বাসিয়া এবং রাঁচিতে ছড়িয়ে পড়ে। মুরহুতে অ্যাংলিকান মিশন এবং সারওয়াদায় রোমান ক্যাথলিক মিশন ছিল প্রধান লক্ষ্য। বিরসাইতরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে প্রকৃত শত্রু ব্রিটিশরা, খ্রিস্টান মুন্ডা নয় এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের ডাক দেয়। তিনি থিকাদার, জায়গিরদার এবং রাজা এবং হাকিম ও খ্রিস্টানদের হত্যার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বন্দুক ও গুলি জলে পরিণত হবে। দুই বছর ধরে, তাঁরা ব্রিটিশদের অনুগত স্থানগুলিতে আক্রমণ করেছিলেন।

১৮৯৯ সালের বড়দিনের প্রাক্কালে, বিরসার অনুগামীরা রাঁচি এবং সিংভূমের গীর্জা পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ১৯০০ সালের ৫ জানুয়ারী, বিরসার অনুগামীরা একেডিহে দুই পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে। ৭ জানুয়ারি, তারা খুঁটি থানায় হামলা চালায়, একজন কনস্টেবলকে হত্যা করে এবং স্থানীয় দোকানদারদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে। স্থানীয় কমিশনার, এ. ফোবস, এবং ডেপুটি কমিশনার, এইচ.সি. স্ট্রেটফিল্ড, ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ দমন করতে ১৫০ জন লোক নিয়ে খুঁটি ছুটে আসেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসন বিরসার জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কারও নির্ধারণ করেছিল। ফোবস এবং স্ট্রেটফিল্ডের নেতৃত্বে সৈন্যরা দুম্বারি হিলে মুন্ডার গেরিলাদের আক্রমণ করে পরাজিত করে, যদিও মুন্ডা নিজেই সিংবুম পাহাড়ে পালিয়ে যায়।

১৯০০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চক্রধরপুরের জামকোপাই জঙ্গলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ডেপুটি কমিশনার রাঁচির মতে, চিঠিতে, ৪৬০ জন আদিবাসীকে ১৫ টি বিভিন্ন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যার মধ্যে ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। একজনকে মৃত্যুদণ্ড,৩৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২৩ জনকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিচার চলাকালীন কারাগারে বিরসা মুন্ডা সহ ছয়টি মৃত্যু হয়েছিল। বিরসা মুন্ডা ১৯০০ সালের ৯ জুন জেলে মারা যান। তার মৃত্যুর পর আন্দোলন ম্লান হয়ে যায়। ১৯০৮ সালে, ঔপনিবেশিক সরকার ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন (CNT) প্রবর্তন করে, যা উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের কাছে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে।

বিরসা মুন্ডা দীর্ঘজীবী হন।

ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাব কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থ চলে গেছে হ্যাকারদের একাউন্টে

প্রসেনজিৎ দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রকল্প। নাম 'তরুণের স্বপ্ন'। প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ও পোষীত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য (যারা একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত)। অন লাইন ক্লাস বা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে শিক্ষা গ্রহণের সহায়ক আধুনিক বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম 'ট্যাব' কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা যে প্রকল্পের মূল ভাবনা বলে সরকার ঘোষণা করেছে। কেউ কেউ বলেন নয়া শিক্ষা নীতি প্রণয়নের সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে গেলে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়,এটা তারই অংশ।

এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রী'রা তাদের নিজের নামে ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলবে। সেই অ্যাকাউন্ট নম্বর ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের IFSC কোড উল্লেখ করে নির্দিষ্ট তথ্য তার বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করবে। বিদ্যালয়গুলি যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও IFSC কোড বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কে সরবরাহ করেছে, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর এই প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত বিদ্যালয় গুলিতে সরাসরি অনলাইন ব্যবস্থায় অর্থ প্রদান করবে। আবার সেই অর্থ বিদ্যালয় গুলি পূর্বে প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী'র ব্যাংক অ্যাকাউন্টে RTGS/NEFT - এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থ অর্থাৎ দশ হাজার টাকা জমা করবে। এটাই এই প্রকল্পের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

এই বছরে এই প্রকল্প রূপায়ণের সময় বহু সংখ্যক ছাত্র - ছাত্রী লক্ষ্য করেন যে তাদের অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের অর্থ জমা হয়েছে বলা হলেও কোনো অর্থ জমা পরে নি। এই সংক্রান্ত অভিযোগ বেশ কিছু জায়গা থেকে আসা শুরু হওয়ায় প্রশাসন খোঁজ খবর শুরু করে। সংবাদ মাধ্যম বিষয় টি নিয়ে চর্চা শুরু করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যারা অর্থ পান নি, তাদের অর্থ অন্যের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয় অ্যাকাউন্টগুলো হ্যাক হয়েছে। এবং এই দুষ্কর্মে জড়িতরা প্রতিবেশী রাজ্যের দুষ্কৃতি। কিন্তু অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায় যে প্রকৃত উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট বদল হয়ে যাদের অ্যাকাউন্টে ওই নির্দিষ্ট অর্থ জমা হয়েছে তারা বেশিরভাগই আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মানুষ। এমনকি অভিযুক্তদের তালিকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শিক্ষাকর্মী ও ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাও আছেন। শুরু হয় ধর পাকর, সবচেয়ে বেশী অভিযুক্ত আটক হয় উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে। এখান থেকে আটক হওয়ার সংখ্যা এখনপর্যন্ত ১৫ জন। এ ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকেও এই অভিযোগে বেশ কিছু মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে শাসক ঘনিষ্ঠরাও আছে।তাদের বিরুদ্ধে

মামলাও হয়েছে। এই পর্যন্ত এই মামলার সংখ্যা ১৪০ টি। ১২২০ টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কে ফ্রিজ করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৬৮ লক্ষ টাকা। দুর্নীতির তালিকায় শীর্ষ স্থানে থাকা বাংলায় নয়া সংযোজন 'ট্যাব কেলেঙ্কাবি'। সরকার ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে দুর্নীতির কারণে বঞ্চিত উপভোক্তাদের প্রাপ্য অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। জনগণের টাকায় ডোল বা ড্যামেজ কন্ট্রোলে অর্থ খরচে সিদ্ধহস্ত সরকার একই পথ ধরে হাঁটলেও, এই দুর্নীতি কিন্তু অনেকগুলি প্রশ্ন সাধারণ নাগরিকদের মনের সামনে নিয়ে এলো, সে গুলি হলো - আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা প্রদানের যে ব্যবস্থা আছে,তাতে এত বড় ফাঁক ফোকর তৈরি করার আসল কারিগর কারা, শুধু মাত্র এই প্রকল্প না আরো অনেক প্রকল্পেও এই অনিয়ম চলছে, যা আমরা এখনো জানতে পারি নি। অর্থ তছরুপ হচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে এবং একই কায়দায়। কারা এর নিয়ন্ত্রক বা পরিকল্পনাকারী।

আমাদের রাজ্যে প্রতিটি দুর্নীতি তে শাসকদলের নেতা থেকে কর্মী'রা যুক্ত থাকছেন, এর দায় কার।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি হয়, কেউ কেউ অভিযুক্ত হিসাবে ধরাও পরে, কিন্তু শাস্তি হয় না। সেই কারণেই বোধ হয় এ রাজ্যে দুর্নীতি রোধ দূর অস্ত।

স্মরণ : অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী। ৮৮ বছরের এই মানুষটি অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক বরণীয় শিক্ষক, গবেষক এবং লেখক। স্ত্রী লেখিকা যশোধরা বাগচী আগেই প্রয়াত হয়েছেন।

মুর্শিদাবাদে জন্ম,পড়াশোনা প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। পিএইচডি করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘকাল। এই সেন্টার থেকেই তিনি আরবিআই অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহন করেন। এরপর তিনি ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর প্রতিষ্ঠিত অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্বভার নেন।

তার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে পেরিলাস প্যাসেজ ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল অ্যাসেনডেন্সি অব ক্যাপিটাল, কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি, ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড লেবার রিডিফাইন্ড ইন্ডিয়া অ্যান্ড থার্ড ওয়ার্ল্ড, দ্য ইভোলিউশন অব স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি। মার্কসবাদী অর্থনীতিতেও তিনি বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। রাষ্ট্রসংঘের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৮০ তম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি পদ্মশ্রী পুরষ্কারে ভূষিত হন।

তাঁর প্রয়াণে সারস্বত সমাজ এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বকে হারালো। অর্থনীতির মার্কসীয় চর্চার ক্ষেত্রেও শূন্যতা সৃষ্টি হল।

স্মরণ : কবি অরুণ চক্রবর্তী

গত ২৪ নভেম্বর চলে গেলেন আত্মভোলা স্বভাবকবি অরুণ চক্রবর্তী। সন্ধ্যাবেলায় গিয়েছিলেন কলকাতার মোহরকুঞ্জে জঙ্গলমহল উৎসবে। রাতে চুঁচুড়ার বাড়িতে ফিরে অসুস্থ বোধ করেন। আর চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়নি। জন্ম ১৯৪৬ এর সেপ্টেম্বরে কলকাতার বাগবাজারে। বয়স হয়েছিল ৭৮।

জঙ্গলমহল আর লালমাটির দেশ তাঁকে টানতো। লাল রঙের জোব্বা, একমুখ দাড়ি, মাথায় বাধা রঙিন ফেট্টি। যেনো সান্তাক্লজ। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে লজেন্স আর টফি। সব বাচ্চাদের জন্য। সবাইকে ডাকতেন 'বুড়ো' বলে। শ্রীরামপুর স্টেশনে রেললাইনের ধারে অযত্নে বেড়ে ওঠা একটি মহুয়া গাছ দেখে লিখেছিলেন 'লাল পাহারীর দেশে যা, রাঙ্গা মাটির দেশে যা, হেথায় তোকে মানাইছে না রে , এক্কেবারে মানাই ছে না রে।'

এই কবিতাই বাঁকুড়ার সুভাষ চক্রবর্তীর লোকসুরে, ভি. বালসারার সঙ্গীত অনুষঙ্গে ও ভূমির উপস্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ল দেশ বিদেশে বঙ্গভাষী মানুষজনের মাঝে। অসংখ্য লিটল ম্যাগ এ ছড়িয়ে রয়েছে অরুণদার কবিতা। তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রাণের যোগ। এই বছরই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একমাত্র কাব্য গ্রন্থ 'অরুণ চক্রবর্তীর কবিতা।'

অরুণদাকে দেখেছি কেন্দুলির বাউল মেলার আখড়ায় ভরা আসরে। সেখানে গৌর খ্যাপা যেমন আকর্ষণ, তেমনি আকর্ষণ এই বাউল কবি সান্তাক্লজ খ্যাপা। আবার তাঁকে দেখেছি পুরুলিয়া জেলার ডুঙরি পাহাড়ের সৃজন মেলায় সাঁওতাল ভাই বোনদের সঙ্গে ধামসা মাদলের তালে পা মেলাতে। পেশায় বি. ই কলেজ থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়ার, স্বভাবে বাউল কবি অরুণ চক্রবর্তী রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী জয়শ্রী চক্রবর্তী , দুই পুত্র, পুত্রবধূ , দুই নাতি এবং অসংখ্য অনুরাগী পাঠক দের।

উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে প্রাচীন মসজিদ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সম্ভল। এখানে অবস্থিত শাহী জামা মসজিদ পাঁচ শতাধিক বছরের প্রাচীন। শতাধিক বছর আগে ১৯২০ সালে এই মসজিদের প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটিকে সংরক্ষিত মসজিদ বলে ঘোষণা করে। এই নিয়ে অতীতে কখনও কোনো বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। কিন্তু ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার বাবরি মসজিদের জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। এর আগে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর এক উন্মত্ত হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক জনতা উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে প্রকাশ্য দিবালোকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। তাদের

বক্তব্য ছিল সম্রাট বাবরের আমলে নাকি শ্রী রামচন্দ্রের জন্মস্থান মন্দির ভেঙে তার ওপর মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট স্বীকার করে ASI সার্ভে করে ওই জমিতে মাটির নিচে কোনও মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পায় নি। শীর্ষ আদালত এ কথাও বলে যে, ১৯৪৯ সালের ২৩/২৪ ডিসেম্বরের মাঝ রাতে ওই মসজিদে রামলালার মূর্তি রেখে আসা ছিল এক ক্রিমিনাল অফেন্স। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনাও ছিল গুরুতর রকমের অপরাধ। যদিও এর জন্য কোনও শাস্তিই কারো হয় নি। উল্টে সুপ্রিম কোর্ট বলল যে ওই জমিতেই রাম মন্দির নির্মাণ হবে, তার কারণ কোটি কোটি মানুষ মনে করে ওখানেই শ্রীরাম চন্দ্র জন্মেছিলেন। এই অন্ধ বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতেই হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির উৎসাহের কারণ।

যদিও ১৯৯১ সালে সংসদে প্রণীত উপাসনাস্থল সংরক্ষণ আইনে পরিষ্কার বলা আছে ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট - এ যেখানে যে ধর্মের উপাসনাস্থল ছিল তাই থাকবে। কোনও ভাবেই তা পরিবর্তন করা যাবে না। অথচ এই আইন থাকা সত্বেও লোয়ার কোর্ট নির্দেশ দিল কাশির জ্ঞান বাপি মসজিদে সার্ভে হবে। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস চন্দ্রচূড় সাহেব বিচিত্র নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন 'পরিবর্তন হবে না, তবে সার্ভে করলে অসুবিধা কি ?'

এইবার প্যানডোরার বক্স খোলা হল। জনৈক হরিশংকর জৈন ও আরো সাতজন জেলা আদালতে গত ১৯ নভেম্বর আপিল করে বললেন যে পাঁচশ বছরের পুরোনো সম্ভল শাহী মসজিদ হরিহর মন্দিরের ওপর নির্মিত। তাই সার্ভে করতে হবে।অমনি জেলা আদালত এক্স পার্টি জাজমেন্ট দিয়ে বলল এখনই সার্ভে করতে হবে। শাহী মসজিদ কমিটির বক্তব্য শোনা হলোনা। সব কিছু রেডি ছিল। ডি.এম, এস.পি সবাই মিলে নেমে পড়লেন। ২০ নভেম্বর সার্ভের নামে সব কিছু শান্তিপূর্ণ ভাবেই মিটল। কিন্তু ২৪ তারিখ বিশাল বাহিনী সঙ্গে উন্মত্ত জনতা, তারা স্লোগান দিচ্ছে জো হুকুম,জয় শ্রী রাম। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। প্রতিবাদ করতেই ট্রিগার হ্যাপি পুলিশের গুলি বর্ষণ। ৫ জন নিহত হন। উদ্দেশ্য সফল। এখন উত্তরপ্রদেশের যেখানে যত মসজিদ আছে সর্বত্র তার নিচে মন্দির আছে বলে প্রচার চলছে।

এদিকে জেলা আদালতের একতরফা রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে সম্ভল শাহী মসজিদ আপিল করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সার্ভে বন্ধ রেখেছে। মসজিদ কমিটিকে বলেছেন নিজেদের বক্তব্য নিয়ে হাই কোর্টে আপিল করতে।

মসজিদ কমিটির আইনজীবী এ আহমদি বলেছেন 'সার্ভের নির্দেশ গুরুতর আইন শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরী করতে পারে। এই রকম অন্তত ১০টি মামলা ঝুলে আছে। একটা করে সার্ভের নির্দেশ হবে, আর তৈরী করা হবে নানা কাহিনি।' সুপ্রিম কোর্ট আইন শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে বলেছেন। উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসনের ভূমিকা কি হবে এখন সেটাই দেখার।

বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে দু একটি কথা

শুভ বসু

ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক সত্ত্বার প্রতিক্রিয়ার তফাৎ আছে। রাজনৈতিক সত্ত্বা ছটফট করে চট জলদি প্রতিক্রিয়া দিতে আর ইতিহাসের বিশ্লেষণ বলে অপেক্ষা করতে।একটি প্রক্রিয়া সবে শুরু হয়েছে,তার পরিণতি কি হবে তা ভবিষ্যতের গর্ভে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গেলে শুরু করতে হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। ১৯৪৭ এর পূর্বে ভারত বর্ষে সব থেকে শক্তিশালী পাকিস্তান পন্থী আন্দোলন ছিল অবিভক্ত বাংলায়। পাকিস্তান শব্দের উদ্ভাবক চৌধুরী রহমত আলী কিন্তু বাংলার আদ্যক্ষর ব্যবহার করেন নি তাঁর এই নামের উদ্ভাবনে। পাঞ্জাব সিন্ধু আফঘানিয়া বা খাইবার পাখতুনখোয়া বালুচিস্তানের আদ্যক্ষর বা অন্তিম নিয়ে পাকিস্তানের উদ্ভাবন। চৌধুরী রহমত আলী কিন্তু পরে বঙ্গ-ই- ইসলামিস্তান বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি ভারত এবং শ্রীলংকার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম প্রভাবিত অঞ্চলে আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন যেমন মোপলাস্তান , ওসমানিস্তান প্রভৃতি।

বাংলার মুসলিম জাতীয়তাবাদ কিন্তু মূলত ছিল কৃষি প্রশ্ন কে নিয়ে। বাংলার প্রজা আন্দোলনের প্রশ্নে উদ্ভিন্ন বাঙালি মুসলমান কে মধ্যবিত্ত জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ নিয়ে সংগঠিত করেছিলেন কিন্তু তাঁরা সার্বিক ভূমি সংস্কারের পক্ষে ছিলেন না। উদীয়মান কমিউনিস্ট পার্টি সার্বিক ভূমি সংস্কারের কথা বলতো। কিন্তু বাংলার পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে শ্রেণী স্বার্থেই সে কথা বলা সম্ভব ছিল না। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সালে মুসলিম ছাত্র লীগের সংগঠন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়ক রশিদ আলীর মুক্তির দাবিতে ও নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে জোরদার আন্দোলন করেছিল। ১৯৪২ সাল থেকে এই সংগঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন সেকালের ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্র শিষ্য। বর্ধমানের আবুল হাসিম, যিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মন্ত্র শিষ্য আবুল কাসেম সাহেবের সন্তান, তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল ইসলামী সমাজতন্ত্রের আদর্শে গঠিত। তিনি বাংলার মুসলিম লীগের একটি গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক নির্বাচনী ইস্তেহার রচনা করেন। যে ইস্তেহার ১৯৪৬ এর নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯৪৬ এর নির্বাচনে জনগণের মাত্র ৮ শতাংশ ভোট দিতে পারতেন। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হতো। তবে তখন ছিল Separate Electorate, অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে শুধু মুসলমানরাই ভোট দিতে পারত।

১৯৪৭ সালে দলিতদের একটি অংশ পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেন বরিশালের যোগেন মন্ডলের নেতৃত্বে এবং মুহাম্মদ

আলী জিন্না তাঁকে বাংলা থেকে অবিভক্ত ভারতের যে অন্তবর্তীকালীন সরকার হয়েছিল তাতে মুসলিম লীগের কোটায় মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেন। তিনি আইন মন্ত্রী হন। পরে ১৯৫০ এর দাঙ্গার সময় যোগেন মন্ডল দলিতদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে পাকিস্তান ছাড়েন।

১৯৪৭ সালে যখন বাংলাভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব আবুল হাসিমের সঙ্গে একটি স্বাধীন যুক্তবাংলার প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত হন কংগ্রেসের শরৎ বসু এবং কিরণ শংকর রায়। কিন্তু সে প্রস্তাবে পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ হিন্দু নেতার আপত্তি ছিল। তাঁরা বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেন। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু অধ্যুষিত বাংলার বর্ধমান বিভাগকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুলেছিলেন। কংগ্রেসের নেতারা বড় লাট মাউন্টব্যাটেনকে দেশ ভাগের পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলেন। জিন্নার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বড়লাট মাউন্ট ব্যাটেনের সমর্থনে নেহেরু এবং প্যাটেল ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করেন। সেই সময় মুসলমান নেতাদের মধ্যে একমাত্র ফজলুল হক বাদে সবাই ছিলেন পাকিস্তান পন্থী। তরুণ শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন ছাত্র আন্দোলনের পাকিস্তান পন্থী অংশের নেতৃত্বে এবং তিনি অবিভক্ত বাংলা কে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর আত্ম জীবনীতে সে কথা সুপস্পট ভাবে উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবর রহমান মুসলিম ছাত্র লীগের নেতৃত্বে ছিলেন। সেকালের 'বাম পন্থী' অলি আহাদ প্রস্তাব করেন ছাত্র লীগের নাম থেকে মুসলিম নামটা বর্জন করতে তার প্রতিবাদ করেন শেখ মুজিব। তিনি মুসলিম নাম রাখার স্বপক্ষে ছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম তাজউদ্দীনের দিনলিপি পড়লে বোঝা যাই তিনি কি রকম খুশি হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্টায়।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই নিয়ে বিতর্ক। সেই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কে কিন্তু পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র কি হবে সেই নিয়ে বিতর্ক ছিল। কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রর ভবিষৎ কি হবে তাই নিয়ে আলোচনা জন্যে ১৯৪৪ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি তৈরী হয়। তাতে কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার, রেডিকাল হিউম্যানিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে পূর্বপাকিস্তান রেনেসাস সোসাইটি পূর্ববাংলার লোক সংস্কৃতি কে অবলম্বন করে পাক- বাংলার সংস্কৃতির উত্থান হবে বলে মনে করতেন যা তাঁরা পশ্চিবাংলার মধ্যবিত্ত সাহিত্যের থেকে আলাদা বলে মনে করতেন। সে যুগের আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা আবুল মনসুর আহমদের লেখা পড়লে এ কথা স্পষ্ট হবে। । উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে সেই সম্ভাবনা চলে যাবে বলে ঢাকার তামাদ্দুন মজলিশ আন্দোলন শুরু করেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী সৈয়দ মুজতবা আলী বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ এ নিয়ে বক্তব্য রাখেন যা কলকাতার চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি অবশ্য রাজরোষে পরে তাঁর জন্মভূমি ভারতে চলে আসেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষার স্বাধিকার বা মুখের ভাষা অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে যে ছাত্র এবং তরুণ লেখকদের যে রাজনীতির সূচনা হয় তার সাংস্কৃতিক বোধ ছিল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির বাঙালি চেতনার সাংস্কৃতিক বোধের চাইতে আলাদা ছিল। সেই সময় প্রতিভাবান কবি সনেট লেখক ফররুখ আহমদ, যিনি ছিলেন মনে প্রাণে পাকিস্তান পন্থী, তিনি বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হবার পক্ষে ছিলেন। স্বাধীন পাকিস্তানে সেটা ছিল প্রথম ছাত্র আন্দোলন।

আমার একথা বলার কারণ আজকের রাজনৈতিক বিতর্ক এবং তার পরিণতি। ছাত্র আন্দোলন এবং গণআন্দোলন কোন দিকে মোর নেবে এবং কি তার পরিণতি হবে তার ইতিহাস রচনার সময় এখনো আসে নি। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো বাংলা ভাগ, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক উদ্ভব এবং ১৯৫৬ সালে তার পূর্বপাকিস্তানে পরিণতি লাভ সরকারি নামকরণের দিক থেকে। যে শেখ মুজিবর মুসলিম ছাত্র লীগ থেকে ছাত্র লীগ নাম হতে দেন নি, তিনিই আবার ছাত্র লীগ নামকরণ করান। আওয়ামী মুসলিম লীগ করেন। পরে যা আওয়ামী লীগ হয়।পূর্ব পাকিস্তান নাম করণের বিরোধিতা করেন ১৯৫৬ সালে। ১৯৭১ সালে শেখ মুজিব কারারুদ্ধ হলে তাজউদ্দীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ইতিহাস থেমে থাকে না । ইতিহাসের গতিপথ পালটায়।

তাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায় একটু পরে দেখান জনতার বিক্ষোভ নিয়ে জর্জ রুদের The Crowd in History A Study of Popular Disturbances in France and England– ১৭৩০-১৮৪৮ জনতার সংজ্ঞা কি কি ভাবে তা বদলায় এবং কেন বদলায় তার সঙ্গে মব বা বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টির তফাৎ কোথায় । পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের গতিপথ পাল্টেছে ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে। ১৯৫২ র ছাত্র আন্দোলন , ১৯৬২ শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন , ১৯৬৯ গণ অভ্যুথান , ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ২০০৮ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং ২০২৪ এর ছাত্র অভ্যুথানের মধ্যে দিয়ে । কিন্তু এর সম্পর্কে কথা বলার সময় ঐতিহাসিকের আসে নি। রাজনৌতিক সত্ত্বার মুখ খোলার প্রশ্ন অবশ্যই আছে । প্রয়োজন রয়েছে বলার যে রাষ্ট্র কাঠামোয় কি প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরের অভাবে বার বার গণ বিক্ষোভ হয়েছে এবং ইতিহাসের কেন দিক পরিবর্তন হয়েছে? তবে ইতিহাসের কাঠগড়ায় এর বিচারের দিন এগিয়ে আসছে ।

লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।